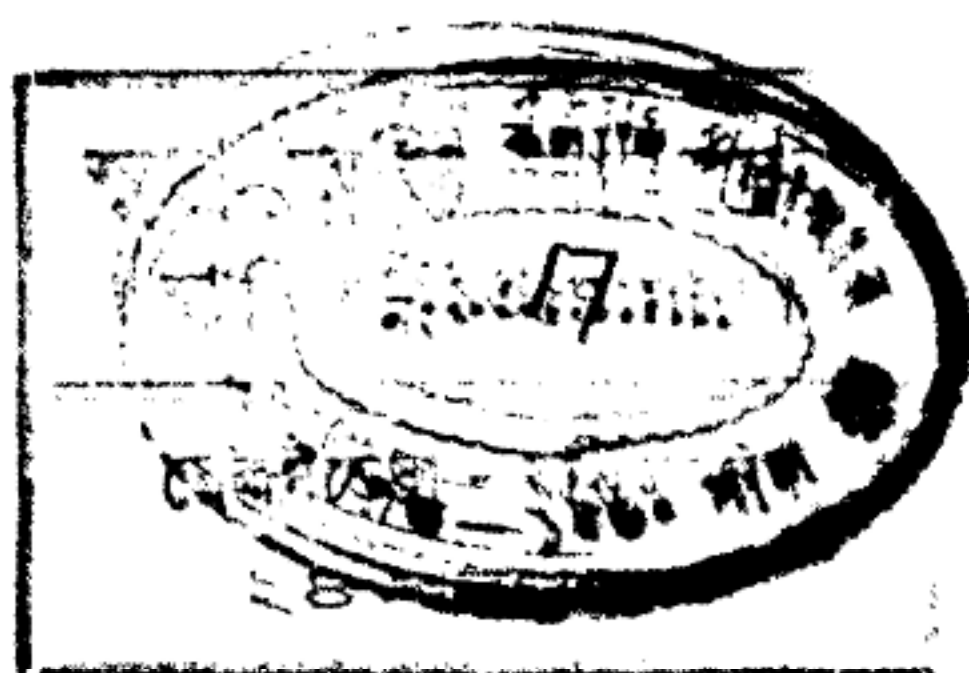




নামজাদা শিশুসাহিত্যিক
 শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
 প্রণীত



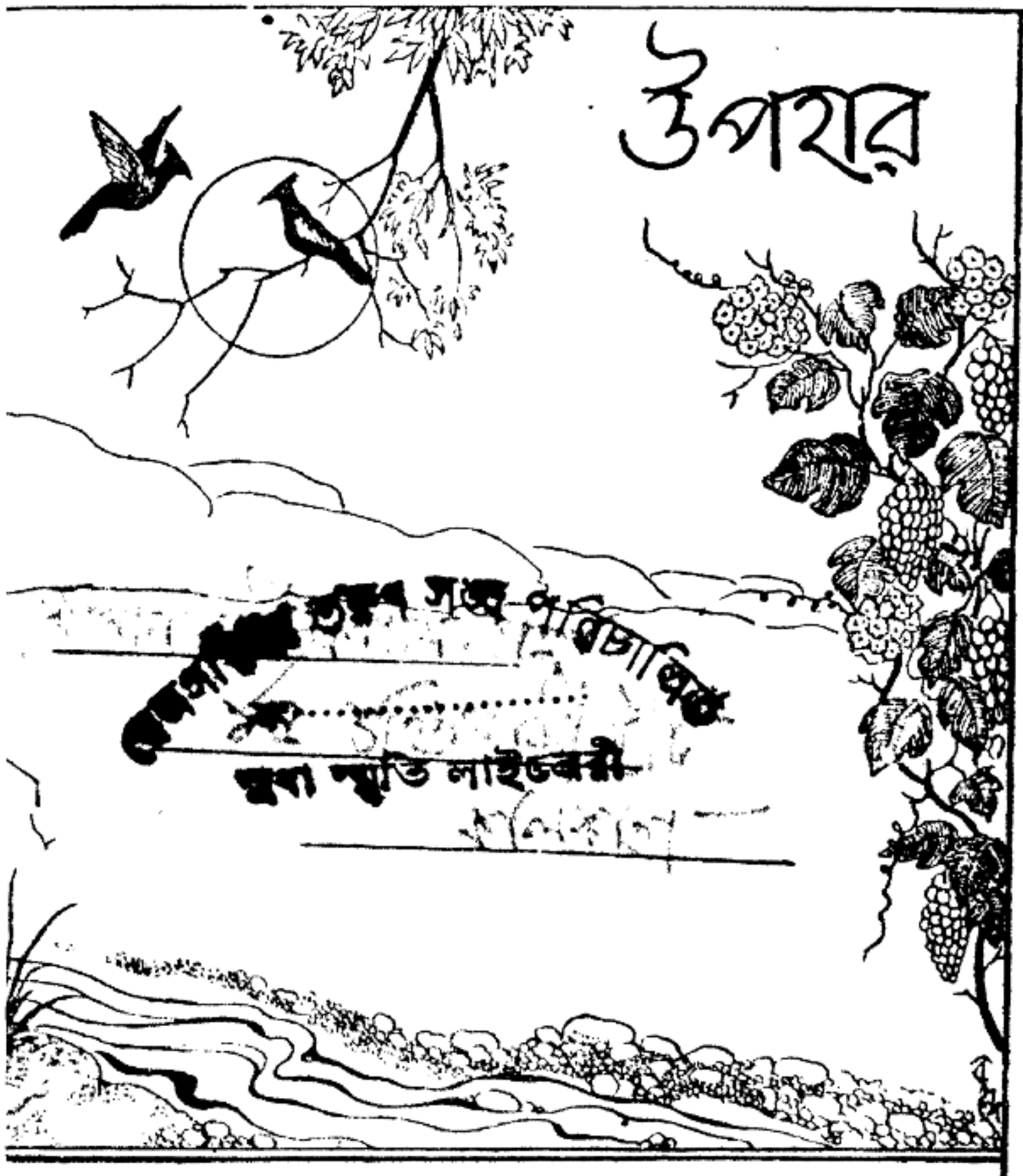
পাল প্রকাশনা নিকেতন
 ২০৩২এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীনন্দলাল পাল
২০৩২এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি, ১৩৫২
মূল্য—আট আনি

প্রিন্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩, চান্দা বাগান লেন, কলিকাতা

উপশ্রব



মহাদেব তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল—“এসময়ে বাইনা-কুলারটা থাকলে বড় সুবিধা হত—”

অমরও সামনের সেই পাহাড়টার দিকে তাকিয়েছিল। বলল—“সেদিন তাড়াতাড়িতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সেখানে গেলে কিন্তু বাইনা-কুলারটা ও জলের বোতলটি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কারণ, বনে আর যাই থাক চোর নেই—”

মহাদেব বলল—“দেখছ লোকগুলোর মাথায় যেন শিং—”

“শিং না পালক ?”

“পালক পরে রেড ইণ্ডিয়ানেরা”

সামনের ঢালুটির ওপর একখানা ছোট পাথর গড়িয়ে দিতে দিতে অমর বলল—“আর এখানে বসে কি হবে ?”

—“যাবে কোথায় ?”

—“ধানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক। মনে হচ্ছে, আমরা একেবারে ব্রহ্মের সীমান্তে এসে—ও কিসের শব্দ ?” বলেই অমর কান পেতে শুনতে লাগল।

মহাদেবও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

কিন্তু শব্দটা কিসের ও কোনদিক থেকে আসছে কেউ বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে নিস্তরক বনভূমির একেবারে অন্তঃস্থল থেকে শব্দটা উঠছে গাং গাং গাং গাং !

মহাদেব বলল—“সেই মানুষগুলো কোথায় গেল ?”

অমর লাকিয়ে উঠে বলল—“ওঠ পালাও—ঐ যে তারা

বাণির ওপর দিয়ে নদীর দিকে আসছে। মনে হচ্ছে নদী পার হবে। ওদের হাতে ঢাল ও বর্শা—”

—“ঐ যে কয়েক জনের হাতে লম্বা দা। রোদে বর্শার তীক্ষ্ণ আগা ও দায়ের মুখ ঝক্ ঝক্ করে উঠল—”

তাদের পিছনের দিকে একটি ঘন জঙ্গল ছিল। দুজনে তাড়াতাড়ি উঠে হাভারস্থাক দুটি পিঠে তুলে লাঠি দুখানা হাতে নিল।

অমর বলল—“বর্শা—বর্শাখানা নাও—”

মহাদেব বর্শাখানা তুলে নিয়ে অমরের সঙ্গে ঝোপটার দিকে ছুটতে লাগল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অমর বলল—“এখান থেকে দেখা যাক ওরা কোনদিকে যায়—”

মহাদেব বলল—“তবে আরও খানিকটা সরে যাওয়া যাক। ঐ যে ঐ ধয়ের গাছটার নীচে পাথরখানার ওধারে—”

অমর মহাদেবের পিছনে যেতে যেতে একবার ফিরে দেখল। তারপর বলল—“ঐ দেখ ওরা নদী পার হয়ে আমরা যেখানে বসেছিলাম সেই দিকে যাচ্ছে—”

ধয়ের গাছটা সেখান থেকে বেশী দূরে ছিল না। দুজনে সামনে থেকে জঙ্গল সরাতে সরাতে ধয়ের গাছটার নীচে গিয়ে পাথরখানার পাশে দাঁড়ালো।

আবার সেই শব্দ হচ্ছে গাং গাং গাং গাং। মহাদেব বলল—“শুনতে পাচ্ছ ?”

অমর বলল—“হুঁ, শব্দটা পিছন থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না ?”

মহাদেব নির্ভয়ে এখানে-ওখানে তাকাতে তাকাতে বলল—
“ঐ-ঐ দূরে নাচ হচ্ছে, নীচে ঐ পাহাড়টির ধারে তাকিয়ে দেখ ।”

অমর পাথরখানার কাছ থেকে একটু সরে গিয়েই পিছিয়ে এসে বলল—“সেই লোকটি যাকে আমরা তখন মেরে ছিলাম । লোকটার হাতে লম্বা দা । ও আমাদের মাথা নেবার জন্য এগিয়ে আসছে—”

—“তুমি কি পিছিয়ে যেতে বল ?”

—“মোটাই না—”

তার কথা শেষ হতে না হতে পিছনে এক সঙ্গে কতকগুলো লোক চীৎকার করে উঠল ।

দুজনে সতয়ে ফিরে দেখে, সেই লোকগুলো যারা তখন পাহাড় থেকে নেমে আসছিল, তারা একেবারে জঙ্গলের ধারে এসে পড়েছে ।

মহাদেব বলল—“শীগগির, বাঁ ধারে ছুট দাও । ঐ দেখ, লোকটির পিছনে আরো অনেকে—”

—“আমাদের কি ওরা বেড়া জালে ধরবে ?”

—“তার আগেই জাল কেটে সরে পড়া যাক—”

এমন সময় হঠাৎ শাঁ করে তার মাথার ওপর দিয়ে একটা বর্ষা চলে গেল ।

দুই^২নে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যথাসাধ্য জোরে ছুটছে। সামনে ঢালু জমি, তার জায়গায় জায়গায় ছোট বড় পাথর। তার পরে পাহাড়।

ছুটতে ছুটতে অমর বলল—“বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, আমরা এতদূর এসে পড়লাম তবুও আমাদের পিছনে শত্রু বা অস্ত্র কিছুই আসছে না কেন!”

তার শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে গোলমাল শোনা যেতে লাগল। মহাদেব ফিরে দেখে বলল—“যুদ্ধ—লড়াই! অবোধে দা-বর্শা চালাচ্ছে, ঐ দেখ!”

অমরও ফিরে দাঁড়িয়েছিল; বলল—“উঃ! কি বীভৎস দৃশ্য! লোকটা মাথা এক কোপে কেটে ফেলল।

—“শুধু কেটে ফেলল! ঐ যে মাথাটা কুড়িয়ে নিচ্ছে।”

—“পারল না—পারল না। ঐ দেখ ওর দলের এক জনের বর্শা লোকটার বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর মাথা কেটে নিচ্ছে। কিন্তু আর একটা দল এল কোথা থেকে! লোকটা হেড্ হান্টার—”

—“ওরা মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।”

—“বিজয়ী দল আমাদেরও হেড্ হান্ট করবে। এই বেলা সরে পড় অমর—” বলে মহাদেব অমরের হাত ধরে একটা টান দিয়ে পাহাড়টার দিকে ছুটতে গেল।

—“দাঁড়াও। শেষ অবধি কি হয় দেখা যাক।”

—“ঐ যে ওরা পালাচ্ছে—”

—“তবে আর ভয় কি !”

—“কিন্তু এদিকে রাতের আশ্রয় চাই । সারা দিন কুল আর কমলা লেবুর ওপর দিয়ে কেটে গেল—”

—“ঐ দেখ যে লোকটি আমাদের প্রথমে আক্রমণ করেছিল তার মাথাটা মাটিতে লুটোচ্ছে ।

দুপক্ষেই দু’চার জন করে হতাহত হয়েছিল ; কিন্তু যারা নদী পার হয়ে এসেছিল তারা হ’ল জয়ী । তাদের হতাহতদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে দিল ছুট । যারা আহত হয়েছিল, তারা কাতরাচ্ছে । কিন্তু বেশিক্ষণ সে যত্ননা ভোগ করতে হল না । জয়ীদের মধ্যে যাদের হাতে দা ছিল তারা ছুটে লোকটার মাথা কাটতে গেল ।

হেড হান্টারদের ধারণা যে যতগুলো মাথা সংগ্রহ করতে পারবে ; সে তত বড় বীর । বীরত্বে খাটো হতে চায় কে ? তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হল, সেই আগে মাথাগুলো সংগ্রহ করবে । কলে বাধল ঘরোয়া ঘন্থ । ঘন্থের পরিণামে একজনের মাথা ঘাড় থেকে পরিষ্কার নেমে গেল । মাথাশূণ্য রক্তাক্ত খড়টা একপাশে লুটিয়ে পড়ল ।

এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে অমর ও মহাদেবের আর প্রস্তুতি হল না । তারা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সামনের পাহাড়টার দিকে চলতে লাগল ।

ঢালুর ওপর উঠতে উঠতে অমর বলল—“যারা নাচ গানে মত্ত ছিল, তারা কে ?”

—“ঐ যে ঐ পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে। চল আমরা সরে পড়ি।”

এদিকে শীতের বেলা পড়ে আসছে। উপত্যকায় জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের দীর্ঘ ও কালো ছায়া পড়েছে। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে পাখী উড়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ পাখীগুলো টিয়া।

মহাদেব বলল—“জলের কি করা যাবে? জল না হলে ত চলবে না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ—”

অমর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল—“ঐ ডান ধারে ঢালুর পাশে বালি দেখা যাচ্ছে! ওটা সেই জলধারা, যার কাছে আমরা বসেছিলাম—”

—“আমার হাভারস্টাকে চা আর কন্ডেন্সড মিল্কের চারটে খালি টিন আছে...চেপে ঢাকনি বন্ধ করলে জল পড়বে না... চল, এই দিক দিয়ে ওখানে নেমে পেট পূরে জল পান করে দুটো টিনে জল ভর্তি করে আনা যাক।”

—“কিন্তু আজকের রাতও কি গাছের ডালে কাটাবে!”

কথাটা মহাদেবের মনে ছিল না; অমরের কথায় সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারপর বলল—“উপায় কি!”

—“কোন বড় গাছও ত চোখে পড়ছে না যার ডালে দুজনে আশ্রয় নিতে পারি। আচ্ছা ঐ পাহাড়টার ওপর দিকে একটা গুহার মত কিছু দেখা যাচ্ছে না—”

মহাদেব লক্ষ্য করে বলল—“হয়ত ওটা গুহা, অথবা ঐ পাথরগুলোর মাঝে খানিকটা ফাঁক। জায়গা। কিন্তু গুহাই

হোক বা কাঁকা জায়গাই হোক, ওখানে উঠতে উঠতে যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে—”

—“সে এক ভাবনার বিষয় বটে কিন্তু টর্চের আলোয় যতদূর সম্ভব—”

—“ব্যাটারিগুলোও যে শূন্য হয়ে এল।”

তার পর দুজনেই চুপচাপ চলতে লাগল। তারা ঢালুর ওপর থেকে দেখল নদীটার ধারে এক পাল বুনো মোষ। তাদের কতক জলে, কতক ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, দুচারটে এপাশে-ওপাশে মাঝে মাঝে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

অমর বলল—“এরপর হয়ত আসবে বাঘ। ওপারে ঐ লম্বা ঘাসের বন দেখছ। ওর মধ্যে বাঘ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়—”

—“সবই সম্ভব। কেবল জল না হলে আজকের রাত কাটানো সম্ভব হবে না। জল চাই—বাঘ আশুক; হাতী আশুক, এই পিশাচের দেশে মানুষের সঙ্গে একঘাটে জল খাবে—”

মোষগুলোর সকলেরই বোধ হয় জল পান করা শেষ হয়েছিল। তারা মিনিট দুইয়েকের মধ্যেই সেখান থেকে দূরের জঙ্গলটার দিকে দৌড় দিল।

অমররাও ছুটে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়িতে যতটা পারে জল পান করে, তিন দুটোয় ভরে নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল।

তারপর ঢালু জায়গাটির দিকে পাহাড়ের কাছে এসে ওপরে ওঠবার পথ খুঁজতে লাগল।

তিন

কিছুক্ষণ আগেই সূর্য্য পাহাড়েই আড়ালে নেমে গেছে।

যে ছায়া ক্ষীণ ছিল তা গাঢ় হয়ে এসেছে, যেখানে আলো ছিল, সেখানে এখন অন্ধকার।

দুজনে ওপরে উঠছে। গুহাটি বড় জোর একশ ফুট উঁচুতে হবে।

তাদের ডানধারে কোমর-সমান উঁচু জঙ্গল। নানা রকম গাছে ভরা। কোন কোন গাছের পাতা হাতে লেগে হাত কুটকুট করছে; কোন কোন গাছের কাঁটায় ছড়ে কয়েক জায়গায় একটু রক্ত বেরিয়ে এল। ক্ষতগুলো জ্বালা করছে।

অমর বলল—“আর যে কিছু দেখা যায় না। আন্দাজে মনে হচ্ছে আমরা অর্ধেক পথ উঠেছি। এবার টর্চ জ্বাল।”

মহাদেব হাতারশ্রাকটি পিঠ থেকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনে হাঁতড়ে হাঁতড়ে তার মধ্যে থেকে টর্চ বার করে বলল—
“ঐ. যাঃ! এর মধ্যে যে ব্যাটারি নেই। অমর তোমার টর্চটা—”

—“আমার টর্চটার যে বাল্ব খারাপ হয়ে গেছে...”

—“তোমার কাছে সেই যে ভাল ব্যাটারিগুলো পরশু দিয়েছিলাম—”

—“ভুল করছ। পরশু মরি, কাল আমাকে চটো খারাপ

ব্যাটারি দিয়ে বললে এগুলো রেখে দাও, যাহোক কোন কাজে লাগবে—”

মহাদেব হাতারস্থাকটি হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে বলল—
“আমার এটির মধ্যেও খারাপ ও ভাল ব্যাটারিতে মিশিয়ে
গেছে। উপায় ?”

—“দাঁড়াও দেশালাই জ্বালি—” বলে অমর পকেট থেকে
দেশালাই বার করে জ্বাললো। কিন্তু উত্তরে বাতাসের এক
ফুৎকারে তৎক্ষণাৎ কাঠিটা গেল নিবে। আবার জ্বালল, আবার
নিবে গেল। আবার জ্বালবার উদ্যোগ করতেই মহাদেব বলল
—“কাঠিগুলো ফুরিয়ে যাবে। দাঁড়াও এই যে ব্যাটারি
পেয়েছি।”

তার কথা শেষ না হতেই অমর তার হাত চেপে ধরে
বলল—“কি ওটা ?”

তখন গাঢ় অন্ধকারের বন্যায় সমগ্র পার্শ্বভূমি ঢেকে
গেছে। আলোর মধ্যে কেবল আকাশে তারা, নীচে জোনাকী,
শব্দের মধ্যে কেবল উত্তরে বাতাসের হু হু শব্দ ও বিল্লীর
আর্তনাদ।

মহাদেব বলল—“কি ?”

—“ঐ যে নীচে থক থক করে জ্বলছে—”

টর্চটার খোলের মধ্যে তখন ব্যাটারি পোরা শেষ হয়ে
গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ক্যাপটা এঁটে মহাদেব স্নাইচ টিপল।
আলো জ্বলল না।

সে শুক গলায় বলল—“বাম—উঠে আসছে—”

অমর তাকে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—“ওঠ
শীগগির—”

“কোথায়!” মহাদেবের শরীরটা যেন একটু অবশ হয়ে
এসেছিল।

অমর তার সে ভাব বুঝতে পেরে বলল—“আমরা ওর ওপর
দিকে আছি। যদি বাঘই হয় ধরবার সময় আমাদের ঘাড়ে
পাকিয়ে পড়বে! কিন্তু যদি ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকি
হয়ত শেষ অবধি আর ধরবার চেষ্টা করবে না—”

—“করবে না?”

—“না—ওঠ—” বলে অমর মহাদেবকে একরকম ঠেলেই
তুলতে লাগল।

কিন্তু পাথর ভরা পথ। প্রতি ধাপে বাধা।

হাত চার পাঁচ উঠে অমর একবার পিছন দিকে ফিরে
দেখল। ঐ যে এখনও জ্বলছে, আরও খানিকটা যেন উঠে
এসেছে। তার মনে হল, বাঘের মুখে আজ অনিবার্য মৃত্যু।
সে বলল “না, দেশালাইটা জ্বলতেই হল। আমার হাতারস্ত্রাকে
দুখানা ধবরের কাগজ আছে। তাই দিয়ে আগুন জ্বালি।
খামকা প্রাণ দিতে যাব কেন? বলতে বলতে সে ক্ষিপ্ত হাতে
হাতারস্ত্রাক থেকে একখানা ধবরের কাগজ টেনে বার করে
তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

আগুনের আভাষ দেখল, সামনে কয়েকটি ছোট ছোট কাঁটা

গাছের শুকনো ডাল পড়ে আছে। আগুন দেখে মহাদেবের শরীরে শক্তি ও মনে সাহস ফিরে এল। সে তাড়াতাড়ি ডালগুলো জড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

অমর বলল—“তুমি ততক্ষণ টর্চটা ঠিক কর। আমি আগুনটা জ্বালিয়ে রাখছি—”

মহাদেব আবার হাভারশ্রাক থেকে চারটে ব্যাটারি বার করে, টর্চ লাগিয়ে সুইচ টিপল। এবারও আলো জ্বলল না। সে ব্যাটারিগুলোকে অদল বদল করে টর্চে পূরে আবার সুইচ টিপল! নিমেষে তারি থেকে সুতীত্র ও সাদা আলো তীরের মত অন্ধকারের বুক চিরে দূরে গিয়ে পড়ল।

তাতে বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখা গেল। আগুন তখন জ্বলছিল। যে জায়গায় তারা সেই জ্বলন্ত জিনিষ দুটো দেখেছিল, সেই জায়গাটির ওপর টর্চের আলো ফেলতেই সেখান থেকে চট করে একটা কি যেন পাশে সরে গেল।

অমর বললে—“কিছু নেইত—”

মহাদেব তার পর টর্চের আলো চারধারে ঘুরিয়ে বলল—“এবার এখান থেকেই গুহাটা পরীক্ষা করা যাক—”

অমর বলল—“এই শীতে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। আগুনটা থাকতে এস হাত দুখানা সঁকে নিই—”

মহাদেব ততক্ষণে গুহাটি লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলছে। নীচে থেকে সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; ওপরে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

সে আরও বার কয়েক এখানে-ওখানে টর্চটা ঘুরিয়ে বাঁ দিকে তার আলো ফেলেই চমকে উঠল। আলোতে দেখা গেল, সেটা গুহা নয়। ওপরে, নীচে ও পাশাপাশি সাজানো খান কয়েক বড় পাথর। তাদেরই মাঝে যে ফাঁকে রয়েছে সেটাকেই দেখাচ্ছে ঠিক একটা গুহার মত।

অমরও ঠিক সেই সময় জায়গাটার দিকে ফিরে তাকাল; তাকিয়েই বলে উঠল—“ভাল্লুক!”

—“ভাল্লুককে তাড়িয়ে ওর গুহা দখল করতে হবে!” বলে মহাদেব একটু নেমে অমরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ভাল্লুকটার চোখে আলো পড়তেই সেও একটা ক্রুদ্ধ ডাক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটু আগে দুজনেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। এখন বেশ গরম বোধ হতে লাগল।

অমর বলল—“কিন্তু তা না হলে এই গহন বনে নীতে কোথায় রাত কাটাব?”

—“কাজটা বড় সোজা নয়। আর যদি বা ওকে গুহা থেকে বার করা যায়, গুহাটা বেশীক্ষণ দখলে রাখা যাবে না, ও আবার ফিরে আসবে।”

ইতিমধ্যে অমর গোটা কয়েক পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছিল। সে ভাল্লুকটাকে লক্ষ্য করে একখানা পাথর ছুড়ে মারলে।

পাথরখানা গুহার মত জায়গাটার বাইরে একখানা পাথরে লেগে ছিটকে পাশে গিয়ে পড়ল। তার পরই আবার একখানা;

আরও একখানা। শেষের খানা গিয়ে ভাল্লুকটার লাগল ঠিক নাকে। সে আঘাতে ভাল্লুকটা তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল।

মহাদেব বলল,—“এখানে আর এক যুহুর্ভুও নয়। তোমার নির্বুদ্ধিতায় আজ ভাল্লুকের হাতে আবার প্রাণ যাবে—”

—“নেমেই বা যাবে কোথায়! নীচেও ত রক্ষা নাই—”

—“ওপরে থাকলেও ভাল্লুকে ছিঁড়ে খুঁড়ে শরীরটাকে অক্ষত রাখবে না”—বলে মহাদেব আবার টর্চের আলো ভাল্লুকটার ওপর ফেলল; ফেলে বলল—“ঐ দেখ উঠে দাঁড়িয়েছে।”

—দাঁড়াক, আমি ওটাকে শেষ করবই, দাও টর্চটা আমার হাতে—” বলে অমর মহাদেবের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিলে।

—“বেশ। তবে ভাল করেই চেষ্টা করা যাক!” বলে মহাদেব তার হাভারস্থাকের ভেতর থেকে হাত দুই লম্বা ও হাত খানেক চওড়া ছেঁড়া কাপড় বার করে লোহা বাঁধানো লাঠিখানার মাথায় জড়িয়ে বাঁধল। তারপর একটা বড় শিশি থেকে খানিকটা স্পিরিট তার চারধারে ঢেলে শিশিটা আবার ছিপি দিয়ে বন্ধ করে হাভারস্থাকে রেখে লাঠির আগায় আগুন ধরিয়ে দিল। সেটা মশালের মত জ্বলতে লাগল। সেটাকে সামনের দিকে বর্শার মত কাৎ করে ধরে বলল—“ওঠ অমর! টর্চটা এক যুহুর্ভুও সরিও না—”

তুহুনে পাশাপাশি উঠতে লাগল। অমরের পিঠে বর্শাখানা বাঁধা। সে লাঠি ভর দিয়ে উঠছে।

আসামের জঙ্গলে

হাওয়ায় আগুনের শিখা এখানে-ওখানে ঘুরছে। তারা ষত কাছে আসে ভাল্লুকটা তত অস্থির হয়। টর্চের আলোয় তার চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এসেছে, পাথরের আঘাতে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। শেষে যখন দুজনে তার কাছ থেকে প্রায় হাত



দশেক দূরে, তখন সে গুহার ভেতর থেকে বেগে বেরিয়ে পাথরের অঙ্ককারে সরে গেল।

অমরও তাকে অনুসরণ করে টর্চের আলো কেলল।

মহাদেব বলল—“ঐ যে নেমে যেতে যেতে ফিরে দেখছে।

এই বেলা চল, জায়গাটা দখল করে ওর মুখের কাছে আগুন জ্বেলে রাখি। আজও সারারাত চোখে ঘুম আসবে না—”

গাছের ডালের চেয়ে ভাল্লুকের বাসা ঢের ভাল।”

দুজনে ওপরে উঠে গহ্বরটার মুখের কাছে দাঁড়াতেই একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগল।

মহাদেব ভেতরে টর্চের আলো ফেলে বলল—“কোন পচা জিনিষ বা কিছু ত দেখা যাচ্ছে না। তবে কিসের গন্ধ?”

অমর বলল—“ভাল্লুকটার গায়ের। ঐ দেখ ভেতরে অনেকখানি জায়গা রয়েছে, দুজনে স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি শুয়ে থাক। যায়!”

—“চল—সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে একটু আরাম করে বসে একটু জল পান করা যাক—”

—“তার আগে বাইরে আগুন জ্বালবার যোগাড় কর—”

দুজনে গহ্বরটার ভেতর হাভারস্থাক দুটো রেখে চারধারে থেকে শুকনো ঘাস, কাঁচা গাছ জড় করে রাখল। তারপর ধরাধরি করে খান কয়েক পাথর এনে গহ্বরের মুখে সাজিয়ে ঢোকবার পথটা ছোট করে ফেলল।

অমর বলল—“এবার চল। কিন্তু ব্যাটারিটা কি সারারাত জ্বলতে পারে না—?”

—“না, যদি বা জ্বলে, ফলে আর ওটাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। তোমার হাভারস্থাকটা একবার খুঁজে দেখত ;

সত্যই ওর মধ্যে কোন ভাল ব্যাটারি আছে কি না। আমার মনে হচ্ছে যেন, এখনও চারটে আছে—”

“আচ্ছা”—বলে অমর গহ্বরটার ভেতরে ঢুকে সতরঞ্চিখানা খুলে পাথরের ওপর বিছিয়ে দিল।

মহাদেব লাঠির আগা থেকে আগুনটা খুলে শুকনো পাতাগুলোর ওপর ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর সতরঞ্চির ওপর বসে বলল—“এখন বাঘ-ভাল্লুক যেই আসুক না, এখান থেকে এক চুলও নড়ব না। শরীর ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ভেঙ্গে পড়েছে” বলেই সে হাভারশ্যাকটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অমর বলল—“কিন্তু বাইরের আগুন কতক্ষণ থাকবে?”

মহাদেব বলল—“যতক্ষণ হয় জ্বলুক। আর কিছু করতে পারব না। যদি ভাল্লুকটা ফিরে আসে ওর সঙ্গে পাশাপাশি ঘুমোব, ওর গায়ের কন্ডলে এই শীতে আরাম বোধ হবে—”

—“প্রথম রাতে কে জাগবে?”

“তুমি—ভাই” বলতে বলতে মহাদেবের কথা জড়িয়ে এল, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল।

একটিনি জল নিঃশেষ করে নিঃশ্বাস ফিলে অমর বলল—
“বেশ—”

ভেতরে মহাদেবের নাক ডাকছে, বাহিরে আগুন চটপট শব্দে জ্বলছে, ফুলকি উড়ছে, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ করছে, জোনাকীর ঝাঁক যথেষ্ট উড়ে বেড়াচ্ছে, শীতের বাতাস হ হ করে বয়ে

যচ্ছে। হাওয়ায় যেন কতদূর থেকে পার্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে শিয়ালের ডাক ভেসে এল। রাত্রির প্রথম ঘাম উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

অমর বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছে, তার হাতে বর্শা।

ডান

—“ওঠ—ওঠ—মহাদেব—শীগগির ওঠ—”

মহাদেব ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রথমটা বুঝতে পারল না সে কোথায় ও ব্যাপার কি! কেবল দেখল চারধারে অন্ধকার।

—“শুনছ মহাদেব—বাঘ ডাকছে বাঘ—” বলে অমর টর্চের সুইচ টিপল; তার আলো তীরের মত অন্ধকারের বুক চিরে দূরে গিয়ে পড়ল।

মহাদেব বলল—“বাঘ ?—কোথায় ?”

—“তা জানি না! ঐ শোন। সম্ভবতঃ সেই নদীর ধারে ডাকছে—”

—“বাইরে আগুনটাও যে নিভে গেছে দেখছি। ভালুকটা আর আসেনি ?”

“না হয়ত এবার আসবে। এখন রাত ঠিক দুটো—” বলে

অমর তার ঘড়িটা আর একবার দেখে কানের কাছে তুলে সেটা চলছে কিনা পরীক্ষা করল।

মহাদেব বলল—“বর্ষাখানা আমার হাতে দাও। তুমি এবার ঘুমোও—”

অমর সতরঞ্চির ওপর শুয়ে বলল—“মহাদেব, কাল থেকে এই পিঁপড়ার দেশের বাইরে যাবার পথটা খুঁজতে হবে। আর দরকার নেই—”

মহাদেব তার কথার কোন জবাব দিল না। সেও মনে মনে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল—এখানে আর নয়।

অমর ঘুমাচ্ছে, মহাদেব বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মিনিট কতক পরে তার মনে হল, দূরে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, আলোটা এক ভাবে জ্বলছে। ওটা কি?

সে মনে মনে আলোচনা করল, দুপুরে যেখানে নাচ দেখেছিল—এবং যেখানে তারা দু'জনে বসেছিল বা যুদ্ধ হয়েছিল, আলোটা সেইদিকে জ্বলছে না। আলোটা জ্বলছে, তারা যে পাহাড়টার গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে তার ডানধারে। ওখানে যে মানুষ আছে, এতে আর ভুল নেই। কিন্তু অত ওপরে আলো জ্বলবে কেন!

তারা না হয় বাধ্য হয়ে পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মত আর কেউ কি ভাবুককে তাড়িয়ে—কথাটা

শেষ হল না। হঠাৎ গহ্বরটার বাইরে শব্দ হল। ফোঁস ফোঁস। আলোয় তাদের চোখ ছোট হয়ে এসেছে।

সে চট করে টর্চটার সুইচ টিপল, তার মধ্য থেকে আলো ছুটে বেরিয়ে এল। সেই আলোয় সে দেখল, এক জোড়া হায়েনা গহ্বরটার মুখে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে।

আলোয় তাদের চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে। সে বর্শাখানা দিয়ে তাদের একটার চোখে খোঁচা দেবার আগেই জন্তু দুটো অন্ধকারে ডুবে গেল।

মহাদেবের একবার ইচ্ছা হল, গহ্বর থেকে বেরিয়ে দেখে, তারা কোন দিকে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বাধ ডাকছিল, এ অবস্থায় গহ্বর থেকে বার হওয়া বিপজ্জনক। তাছাড়া, তার মনে হয় ভাল্লুকের গহ্বরে তারা আশ্রয় নিয়েছে। ভাল্লুকের গুহার কাছে আসা অসম্ভব নয়।

ঐ যে সর সর শব্দ হচ্ছে কিসের! মনে হচ্ছে, কি একটা টানতে টানতে কে যেন ওপরে উঠছে।

সে একবার ভাবল, অমরকে ডেকে তোলে; আবার ভাবল, সে নিজেকে ত ঘুমিয়েছে। ও বেচারায় ঘুম পরিপূর্ণ হয়নি, শরীরে ক্লান্তি পুরো মাত্রায় আছে। দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়।

শব্দটা ততক্ষণে আরও কাছে এসেছে, সে মনে করলে আরও কাছে আসবে। কিন্তু তা হল না। তার বদলে সেই ভয়াবহ অন্ধকারে চক্ চক্ ও কড়মড় শব্দ হতে লাগল। তার মাঝে মাঝে কি যেন রাগে গুলিয়ে কয়েকটা

মহাদেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার মনে হল, ওটা বাঘ না হয়ে যায় না। বাঘটা একটা কোন জন্তু মেরে চিবিয়ে তার হাড় ও মাংস খাচ্ছে।

মহাদেবের হাত-পা একটু কঁপে উঠল, সে ভুলে গেল যে, তার হাতে চার ব্যাটারির একটি টর্চ। তার স্মৃতির আলোয় যে কোন প্রাণীকে সাময়িক ভাবে অন্ধ করে দেওয়া যায়।

ঐ কড়মড় শব্দটা এত ভয়ানক যে শুনে অবধি তার চিন্তাশক্তি কিছু অবশ হয়ে গেছে, সে চুপ করে টর্চ হাতে নিয়ে বসে আছে।

অমর চিৎ হয়ে শুয়েছিল ;—হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

সে শব্দে মহাদেবের চেতনা হল। সে চট করে সুইচ টিপে অমরকে ঠেলা দিতে দিতে বলতে লাগল—অমর—অমর—ওঠ—ওঠ—শীগগির—”

অমর আন্তে আন্তে চোখ মেলে দেখল, সে আলো-আঁধারের মধ্যে শুয়ে আছে।

মহাদেব আবার ঠেলা দিয়ে বলল—“অমর ওঠ বাইরে বাঘ। একেবারে আমাদের গহ্বরটার কাছে এসে পড়েছে—”

অমর এবার চট করে উঠে বলল—“বাঘ ? গহ্বরটার কাছে এসে পড়েছে ? কি করে বুঝলে ?”

—“কড়মড় শব্দ হচ্ছিল। বোধ হয় কোন জন্তুর হাড়-মাংস খাচ্ছিল—”

—“কৈ এখন শোনা যাচ্ছেনা ত।”

—“হয়তো আলো দেখে, আর আমাদের গলার আওয়াজ শুনে সরে গেছে—”

অমর মহাদেবের পাশে সরে এসে ঘড়ি দেখে বলল—
“রাত চারটে। আর ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে দিতে পারলে হয়, তুমি টর্চটা নিভিও না—”

দুজনে চুপ করে বসে রইল। দূরে শিয়ালের দল রাত শেষ হবার খবর উঁচু গলায় ঘোষণা করল। সে খবরে কার লাভ জানি না। কিন্তু অমর ও মহাদেবের মনে একটু সাহস এল। দু’জনেরই মনে হল, শীঘ্রই রাতের এই ভয়াবহ অন্ধকার দূর করে ভোরের আলো দেখা দেবে।

তারপর সময় কেটে যেতে লাগল। বাইরে সে কড়মড় শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু দুজনেই আশঙ্কা করছে, এই বুঝি বাঘ আসে; বাঘ না এলেও ভালুকটা হয়ত ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে মহাদেব বলল—“আমি দূরে ওপর দিকে একটি আলো দেখছিলাম। এখন আর সেটা নেই—”

—“সম্ভবতঃ কোন পিশাচের আস্তানার আলো সেটা—”

—“কিন্তু অত ওপরে কেন? মনে হয় কোন পাহাড়ের গহ্বর বা আমাদেরই এই গহ্বরটার মত কোন গহ্বরে সে আলো জালিয়ে রেখেছিল—”

—“এ ছাড়া আর কোন রকম ভাবতেও ত পারছি না—”

এমন সময় বাইরে কোথায় যেন কাক ডেকে উঠল। দুজনে গহ্বরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল পূর্বের

পাহাড়গুলোর মাথায় কয়েকটা তারা নিভে গেছে, আর সেখানে ফুটে উঠেছে একটু ভোরের আলো।

আমার বলল—“আর আধ ঘণ্টা”

—“আধঘণ্টাও লাগে না, বিপদ এক মিনিটেই ঘটতে পারে—”

—“দেখা যাক।”

সৌভাগ্যবশতঃ আর কোন উৎপাত হল না, চারধার থেকে হাজার পাখী কলরব করে জানাল—আর রাত নেই। আকাশ-তল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

শীতের সকাল। পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠল, নীচে বনে উপত্যকায় পাহাড়ের গায়ে মাথায় তা লুঠিয়ে পড়ল।

অমর বলল—“এবার চল রওনা হওয়া যাক”—

সতরক্ষিখানা গোটাতে গোটাতে মহাদেব বলল—“এবার করতে হবে খাবারের যোগাড়—”

দুজনে সব গুছিয়ে পিঠে হাতারস্তাক বেঁধে লাঠি ও বর্শা হাতে নিয়ে গহ্বরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল।

নামছে! আগে অমর, তার পিছনে মহাদেব।

হাত কয়েক নেমেই অমর থমকে দাঁড়িয়ে বলল—“ঐ দেখ নিউলী জঙ্গলের কাঁকে—”

মহাদেব এগিয়ে এসে বলে উঠল—“হরিণ। হরিণটাকে কাল রাতের বেলা শিকার করে একটি বাঘ, এইখানে টেনে তুলে খেয়েছে।”

—“শুধু খেয়েছে নয়, খেয়ে এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। সম্ভবতঃ পাহাড়ের ঐ জঙ্গলে—”

—“এত এক বিপদে পড়া গেল। কোন দিকে সে আছে জানবার উপায় নাই। আমাদের যেতে হবে ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তখন তার সামনে পড়াও বিচিত্র নয়—”

তারা দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল—কি করা যায়।

অমর বলল—“ওপর থেকে বড় বড় পাথর জঙ্গলের মধ্যে ছোঁড়া যাক। দু একখানা বড় পাথরও দুজনে ঠেলাঠেলি করে নীচে ঠেলে দিই, চল। বাঘ থাকলে, নিশ্চয়ই সরে যাবে—”

মহাদেব বলল—“সরে না গিয়ে তেড়েও আসতে পারে—”

—“নাও পারে। মহাদেব ভয় করে এমন প্রাণী খুব কম আছে। তার ওপর দিনের বেলা। বাঘের বিক্রম খুব বেশী হবে না—” বলে অমর কতকগুলো ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে নীচে জঙ্গলের এখানে-ওখানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

মহাদেবও তার সঙ্গে যোগ দিল।

প্রায় গোটা পঞ্চাশেক টিল ফেলে তারা দুটো বড় বড় পাথরকে ওপর থেকে ঠেলা দিয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে দিল।

পাথর দুখানা গড়াতে গড়াতে ছড়মুড় করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

দুজনে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জঙ্গলের চারধার দেখছে। মহাদেব বলল—“জঙ্গলটা ওখানটা একটুও নড়ছে না—?”

অমর বলল—“ও হাওয়ায় ঢুলছে। ওখান দিয়ে কোন জন্তু চলে গেলে গাছগুলো ঠিক ওভাবে ঢুলতো না। চল—নাশি—”

—“চল—”

দুজনে সাহসে ভর করে নামতে লাগলো। হরিণের সেই অর্ধভুক্ত মৃতদেহের পাশ দিয়ে নীচের জঙ্গলে ঢুকল।

জঙ্গলটা পার হতে হতে দুজনের মনে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি বাঘটার সামনে পড়ে। কিন্তু কোন জন্তুরই সামনে তাদের পড়তে হল না, তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নির্বিকারে নীচে নেমে গেল।

অমর বলল—“আমরা যে পথে এখানে এসেছি, তা হয়ত খুঁজে পাব না। কিন্তু এই জায়গাটার ম্যাপ যা মনে আছে, তাতে বোধ হয় বরাবর উত্তর দিকে গেলে আসামের মধ্যে পৌঁছতে পারি—”

মহাদেবও সে কথাটি ভাবছে; বলল—“সম্ভব। পশ্চিমদিকে গেলেও বাঙ্গালাদেশে পৌঁছান যায়। আমাদের উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে হোক বাঙ্গালা বা আসামের মধ্যে গিয়ে পড়া।”

—“ঠিক বলেছ। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেবল

পশ্চিম বা উত্তরদিক। ঐত সূর্য। চল, পশ্চিম দিকেই চলি—”

দুজনে ক্রমে সেই ছোট নদীটার ধারে এসে পৌঁছল। তার জলে হাত-মুখ ধুয়ে, খানিকটা জলপান করে টিন দুটোয় জল ভরে নিল।

মহাদেব বলল—“আজ যে রকম কোরেই হোক কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতেই হবে। কোন বন্য জন্তুর মাংস—”

অমর বলল—“আমরা ত শিকারী নই। তবে যদি বল, সেই হরিণটা বোধ হয় এখনও পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে পড়ে আছে, ওর দেহের খানিকটা কেটে আনি—”

কথাটা মুখে বললেও অমরের সে প্রবৃত্তি ছিল না। মহাদেব বলল—“দেখা যাক হাতে বর্শা ও লাঠি আছে, কোন রকমে যদি এ দুটো মাংস সংগ্রহের কাজে লাগানো যায়—”

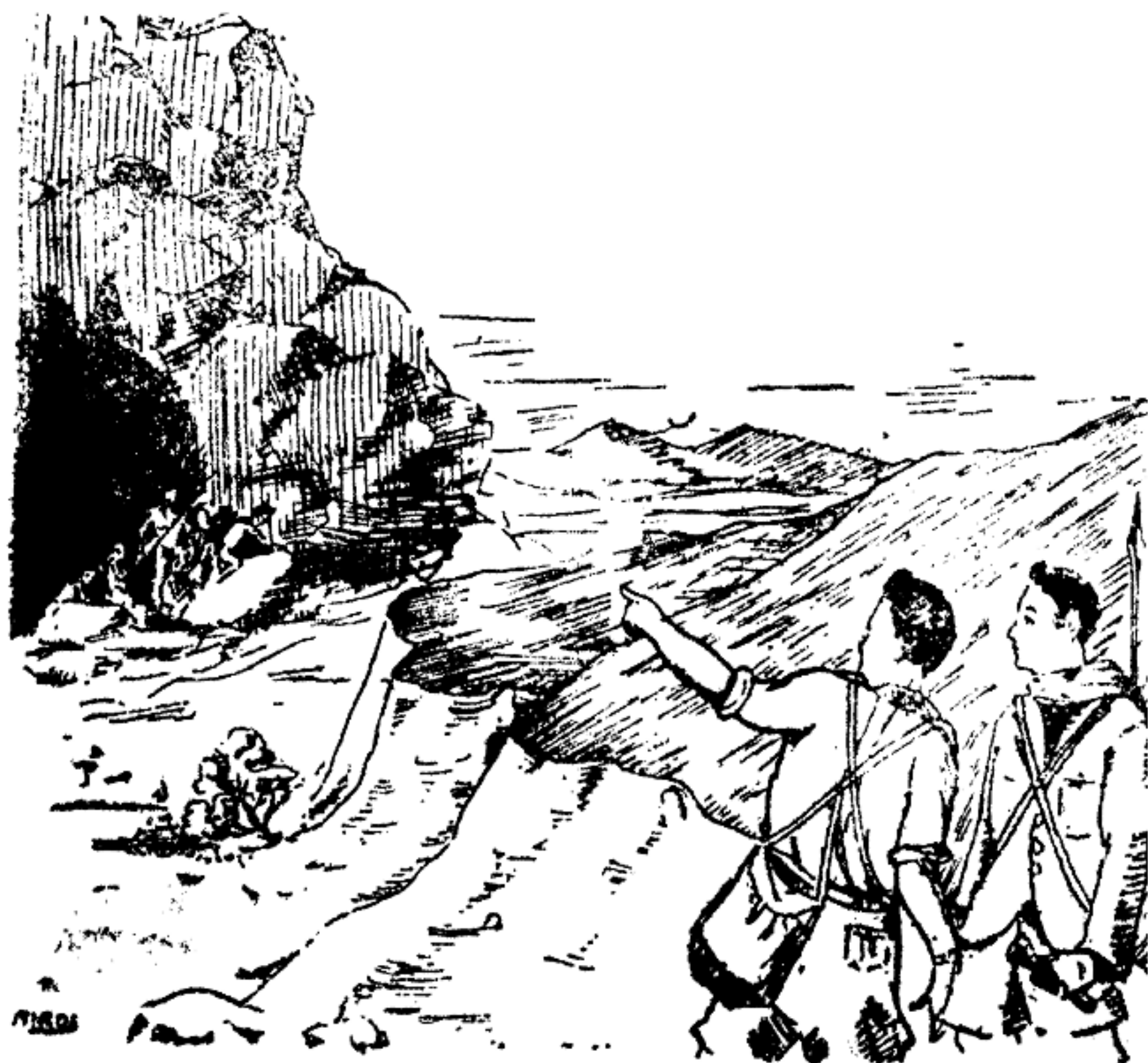
—“যদি নয়,—নিশ্চয় কাজে লাগাতে হবে।” বলে চারধারে তাকাতে লাগল।

মাথার ওপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে, চারধারে জন-মানবহীন জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্যভূমি। এর কোথায় বন্য জন্তু আছে কে জানে; স্মার থাকলেই যে তাকে শিকার করে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে, তাও নয়।

লাঠি ভর দিয়ে দুজনে উচুনিচু জমির ওপর দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল পড়ে।

প্রায় ক্রোশ খানেক এসে মহাদেব বলল—“ঐ পাহাড়টার
ওপর দিকে তাকিয়ে দেখ।”

অমর মহাদেবের নির্দেশমত তাকিয়ে দেখে পাহাড়টার
মাঝ বরাবর একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে অদ্ভুত আকৃতি



জন কয়েক লোক দাঁড়িয়ে। তাদের গায়ে পশুর চামড়া,
মাথার ছোটো শিঙ, বোধ হয় মোষের, গলায় ও হাতে বোধ
হয় হাড়ের অলঙ্কার।

লোকগুলো ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনকে একমনে

দেখছিল। অমর ও মহাদেব তাদের দিকে তাকাতেই তারা চট করে সেখান থেকে সরে গেল।

অমর বলল—“এরা কি আদিম মানুষ? আমরা পৃথিবীর আদিম মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদের যে কল্পনা করি, এদের পোষাকও সেই ধরনের—”

মহাদেব বলল—“স্বভাবও নিশ্চয়ই তাদের মত। বন্য জন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব, কিন্তু এদের কাছে মৃত্তি নেই—”

—“তুমি কি পালাতে বলছ?”

—“হাঁ।”

—“কিন্তু পালাবেই বা কোথায়? আমরা এদেরই রাজত্বে এসে পড়েছি। কাল ত দেখেছিলে, নিজেদের মধ্যেই এরা কি রকম শাস্ত-শিষ্টের মত ব্যবহার করে—তবুও পালাও—” বলতে বলতে মহাদেব বাঁ দিকে জঙ্গলটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল।

অমরও তার পিছনে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সে ফিরে দেখল। দেখেই বলল—“মহাদেব ঐ ওরা আসছে। হাতে বর্শা—ছুট—”

তার কথায় মহাদেবও ফিরে দেখেই বলে উঠল, “পিশাচের দল—”

বনের কাছাকাছি গিয়ে অমর আবার ফিরে দেখেই বলল—“মহাদেব, বৃথা চেষ্টা, ওরা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে—

একদল বনের ভেতর ঢুকে আর এক দল বাইরে ছুটে আসছে—”

বনে ঢুকতে ঢুকতে মহাদেব বলল—“ভবুও চেষ্টা করা যাক। প্রাণ ত আজ গেছেই। আমাদের মাথা ছটো ওরা নিশ্চয় কেটে নেবে—”

কিন্তু সে অঙ্গলের গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে পথ করে ছুটে যাওয়া সহজ নয়। হাত কুড়িক না এগোতেই তাদের পিছনে যারা আসছিল তারা বনে ঢুকে পড়ল।

মহাদেব ফিরে দেখে বলল—“অমর বিনা যুদ্ধে মরার চেয়ে—”

অমর বলল—“বর্ষার বিরুদ্ধে এ লাঠি কিছুই নয়, তার চেয়ে শাস্ত্র-শিক্ষার মত ধরা দেওয়া যাক। তারপর যা আছে ভাগ্যে তাই হবে—”

মহাদেবের চিন্তা অন্য রকম। কিন্তু শেষ অবধি অমরের কথাই থাকল। কেন না আর তিন-চার হাত যেতে না যেতে তাদের পিছনে যারা ছিল, তারা এক হাতে অঙ্গল সরাতে সরাতে বর্ষা উঠিয়ে ধরে তাদের পাশে উপস্থিত হল।

ওদিকে যারা বনে ঢুকে ছিল; বনের ওপরে তাদেরও বুক থেকে মাথা অবধি দেখা যাচ্ছে। ঐ যে তারা আসছে।

অমর ও মহাদেব ভাবল, এখনই তাদের জীবনের শেষ হবে, হয় বর্ষা না হয় দায়ের আঘাতে দেহ আহত হল বলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এরা অমন করে তাকিয়ে আছে কেন?

মহাদেব বিড় বিড় করে বলল—“অমর, এরা আমাদের
দেখে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছে—”

অমরও তাদের মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করে সেই কথাই
 ভাবছিল। কিন্তু মহাদেবের কথার কোন উত্তর দিল না। এক
 দৃষ্টিতে সেই লোক কয়টির চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে
 রইল।

যারা জঙ্গলে ঢুকেছিল, তারাও বন ঠেলতে ঠেলতে উপস্থিত।

মহাদেব ও অমরের চারি ধারে বর্শা, ঢাল ও দা হাতে
সেই জঙ্গলের অধিবাসীরা মিনিট খানেক চুপ-চাপ থাকতে
থাকতে হঠাৎ হাসতে লাগল।

অমর ও মহাদেবের মনে হল, সে হাসির মধ্যে বিদ্রূপ
ফুটে উঠছে।

তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল।
অমর বলল—“কি ব্যাপার বলত মহাদেব ? এত হাসি ও
কথা কিসের ? কি ভয়ঙ্কর ওদের দাঁতগুলো দেখছ ?”

ইঠাৎ একজন দাঁত কড়মড় করতে করতে অমরের মাথার
ওপর দাঁত তুলল। রোদ্রে তার খারালো মুখ চক্ চক্ করে
উঠল। আর একজন চীৎকার করে মহাদেবের বুক লক্ষ্য করে
বর্শা তুলল।

দুজনেরই বুকের ভেতর কাঁপতে লাগল;—এই তাদের শেষ। কিন্তু দুজনেই নিমেষে নিজেদের সামনে নিল। ভাবলে লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করা।

মহাদেব হাতও একটু বাড়ালে। অমর বলল—“ধৈর্য্য, চুপ। মারবার হলে এতক্ষণ আমরা জীবিত থাকতাম না—”

সত্যিই তারা তাদের হত্যা করল না। দাখানা অমরের ঘাড়ে, বর্শাখানা মহাদেব বুকের বাঁধার স্পর্শ করল মাত্র। অস্ত্র দুটির স্পর্শে দুজনেরই শরীরের মধ্যে কেমন একটি বিজী শিহরণ জাগল।

তারপর সেই দুজনে এগিয়ে এসে অমর ও মহাদেবের হাতে ধরতেই বাকী যারা ছিল, তারা চীৎকার করে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মহাদেব বলল—“অমর, আমরা বন্দী না বলির পশু—”

অমর বলল—“দুইই।”

যারা তাদের হাত ধরেছিল, তারা আবার হঠাৎ হেসে উঠল।

অমর বলল—“এদের হাসির কারণ এবার বুঝতে পেরেছি।”

অমরকে কথা শেষ করতে দিলে না, লোকটা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার পাশে চলেছে বন্দী মহাদেব।

মহাদেব বলল—“লোকগুলোর শরীর কেমন পুষ্ট দেখেছ!”

আবার হাসি আরম্ভ হল। যে মহাদেবের হাত ধরেছিল, সে মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় বড় ও অপরিহার্য হাঁত বার করে হাসছে।

অমর বলল—“এ হাসির অর্থ বুঝলে, মহাদেব ? আমাদের কথা শুনে ওরা হাসছে—”

—“ওদের খুশী করবার একটা উপায় পাওয়া গেল—”

—“আমার যতদূর মনে হয় কথার চেয়ে আমাদের রক্ত ও প্রাণই এদের বেশী খুশী করবে।”

দুজনে আর কোন কথা না বলে চুপ করে তাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল পার হয়ে উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে যে পাহাড়ের গুহামুখে লোকগুলোকে দুজনে দেখেছিল, অমর ও মহাদেবকে নিয়ে তারা তার নীচে পৌঁছল।

ছন্দ

তাদের দুজনকে নিয়ে যখন তারা গুহামুখে উঠল, তখন বেলা আটটা। গুহার বাইরে ছোট-বড় হাড় ছড়ানো, ভেতরে অন্ধকার এবং সেখান থেকে একটা উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসছে। সে গন্ধ সহ্য করে সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো দুঃসাধ্য।

অমর ও মহাদেবের চার ধারে ছেলে মেয়ে ও বুড়োর ভিড়। গুহার ভেতরেও জনকয়েক বসেছিল।

অমর ও মহাদেব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সে গুহার

দিকে তাকিয়ে মহাদেবের গা টিপাল। তার পর গুহার দিকে আগুল বাড়িয়ে দেখাল।

মহাদেব দেখল, গুহামুখে তাদের জলের বোতলটা পড়ে আছে। কিন্তু তার গলায় ঝুপ ও গায়ের কেল্ট নেই।

মহাদেব বলল—“যখন জলের বোতল দেখা গেছে, বাইনাকুলারটাও দেখা যাবে—”

সে ও অমর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু বাইনাকুলারটিকে কোথাও দেখতে পেল না।

কয়েক মিনিট পরেই যারা তাদের ধরে এনেছিল, তারা তাদের নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল।

গুহাটি পূর্বমুখো ; সেজন্য তার মধ্যে আলো এসে পড়েছে। কিন্তু কি দুর্গন্ধ !

ভেতরে অনেক খানি জায়গা। অস্তুতঃ ত্রিশজন লোক তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে শুয়ে ও বসে থাকতে পারে।

অমর ও মহাদেবকে তারা একেবারে ভেতর দিয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বাইরের দিকে চলে গেল।

অমর বলল—“এরা দেখছি গুহাবাসী, কিন্তু কোন শয্যা নেই, বাসন পত্রও চোখে পড়ছে না—”

“ঐ যে কয়েকটা হাঁড়ির মত রয়েছে। সর্বনাশ ! এখানেও মড়ার মাথা জড় করা ?”

“কৈ ?”

—“ঐ যে কোণে” বলে মহাদেব হাত তুলে জায়গাটা দেখাল।

অমর বলল—“ওর সঙ্গে তোমার-আমার মাথা দুটোও লীগগিরই কাটা হবে। কিন্তু আর ত দাঁড়ানো যাচ্ছে না, আমি বসছি—”

অমর সেখানে পাথরের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

—“কাটে মাথা কাটুক ; তার আগে কিছু খাব—” বলে মহাদেবও অমরের পাশে বসল।

বাইরে যারা ছিল, তারা সকলে তখন কলরব করছে।

মহাদেব বলল—“ঐ দেখ অমর, তোমার বাইনাকুলারটা।”

অমর দেখল, একজন লোকের গলায় বাইনাকুলারটা ঝুলছে। লোকটা এতক্ষণ সেখানে ছিল না, আগেও তারা তাকে দেখেনি।

অমর বলল—“লোকটা ওর উপকারিতা তাহলে বুঝেছে?”

—“অসম্ভব নয়। কৌতূহলবশে চোখে দিয়ে দেখতে দেখতে ওর উপকারিতা চেপে পড়েছে—”

—“কি করে এ্যাডজাস্ট করতে হয়, তা নিশ্চয় শেখেনি। ঐ দেখ মহাদেব, আমাদের খাবার আনছে—”

“ও যে গিরগিটি, ইঁদুর, ব্যাড্”

কিন্তু সে খাবার গুলো মহাদেবদের জন্য নয়, যে লোকটি এনেছিল, গুহার একধারে বসে সে নিজে সেগুলো খেতে লাগল। তা দেখে তাদের দুজনের খাবার প্ররুতি আর রইল না। স্থণীয় নাড়ি পর্য্যন্ত উঠে আসবার মত হল।

অমর বলল—“মহাদেব, এরা যে কেবল ঐ সব অখাত খায় তা বোধ হয় নয়। ভাল জিনিষও কিছু খেয়ে থাকে। ইসারায় জানাব কিছু খাবার চাই?”

মহাদেব বলল—“এ প্রস্তাব মন্দ ঠেকচে না, শেষ অবধি রাখলে হয়—”



“দেখাই থাক না—” বলে অমর সেই লোকটির কাছে সরে গিয়ে ইসারায় জানালে—“খাবার দাও, শিদের পেট ঝলছে।”

লোকটি প্রথমে তার কথা বুঝতে পারল না। অমর আবার ইসারা করল।

এবার সে বুঝলে। ইসারায় গিরগিটি ও ইঁদুরটা দেখিয়ে বলল—“খাবে?”

অমর ও মহাদেব দুজনেই মাথা নেড়ে জানাল—“না।”

লোকটা আর কিছু না বলে গুহাটার একধারে উঠে গেল। বাইরেও তখন খাওয়া-দাওয়া চলছে, ছেলে মেয়ে, বুড়ো সকলে গোল হয়ে বসে কি যেন খাচ্ছে।

অমর ও মহাদেব গুহার ভেতরের সেই লোকটার কাজ কর্ম লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, সে নোংরা একটি হাঁড়ি থেকে কি একটা তরল জিনিষ একটা পাতার পাত্রে ঢালল। তার চারিধারে তৎক্ষণাৎ মাছি উড়তে লাগল; হাঁড়িটার কানাতেও মাছি বসে আছে। তারপর লোকটা কয়েকটি শাঁকআলু ও কতকগুলো কাঁচা চীনে বাদাম নিয়ে সেই জিনিষটার সঙ্গে তাদের সামনে এনে রাখলো।

মহাদেব বলল—“এ জিনিষটা কি বল ত? এর মধ্যে কয়েকটি মাছি মরে রয়েছে—”

অমর তার গন্ধ শুঁকে বলল—“মনে হচ্ছে মধু” তারপর আঙ্গুলে করে একটু জিবে দিল। মহাদেব জিজ্ঞাসা করলে—“কি?”

“মিষ্টি, বোধ হয় মধু—দেখে—দেখ—”

মহাদেব জিনিষটা একটু জিভে দিয়ে দেখল, কিন্তু তার ভেতর মাছি দেখে খাবার বিশেষ ইচ্ছা হল না।

অমর বললে—“এই শাঁকআলু আর চীনে বাদামগুলোই খাওয়া যাক।”

সে লোকটা তখন বসে বসে ইঁদুর খাচ্ছে। ইঁদুরের হাড়-
গুলো মড়্, মড়্ কোরে চিবোচ্ছে, তার দুকষ বয়ে রস
গড়াচ্ছে।

এ দৃশ্যে ও শব্দে শাঁকআলু এবং চীনে বাদামও তাদের
গলা দিয়ে নামলো না। কিন্তু পেটে তখন আগুন জ্বলছে।
তার কলে দেহে-মনে স্থিতি নেই। তারা লোকটার দিকে
পিছন করে খেতে শুরু করল।

এমন সময় বাইরে ভয়ানক গোলমাল হতে লাগল। তারা
দুজনে ফিরে দেখে জন কতক লোক বর্শা, ঢাল ও লম্বা দা নিয়ে
কোথায় যেন যাবার উদ্যোগ করছে।

অমর বলল—“আমাদের মত কোন পথিকের সন্ধান
পেয়েছে কি? সে না একটু উঠে গিয়ে দেখা যাক—”

মহাদেব অমরের কথায় সায় দিয়ে উঠে গুহামুখে কয়েক
পা এগিয়ে যেতেই সেই লোকটা উঠে এসে তাদের পথ রোধ
করল।

অমর বলল—“আমরা যে বন্দী এ কথা মনে ছিল না।
যখন বন্দী হয়েছি তখন এখানে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসে
থাকি কেন? সতরঞ্চিখানা হাতারস্তাকটার ওপর হেলান
দিয়ে জমিদারের কায়দায় বসা যাক।”

মহাদেব বলল—“খাওয়া ত হল। এবার একটু জল—
তোমার চিনের কোটায় বোধ হয় এখনও জল আছে—”

—“বোধ হয় কি? নিশ্চয়ই আছে” বলে মহাদেব একটা

কোঁটা বের করে তার চাকনি খুলে অর্ধেক জল নিয়ে পান করল বাকীটুকু দিল অমরকে ।

যে লোকটি বসে বসে তাদের পাহারা দিচ্ছিল, সে কোঁটা থেকে জল পান করতে দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কোঁটার দিকে তাকিয়ে রইল ।

সে ঘোর কাটলে সে এগিয়ে গিয়ে কোঁটাটা মহাদেবের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল । তবুও যেন বুঝতে পারল না তার ভিতর কি করে জল থাকতে পারে ।

অমর বলল—“বুঝিয়ে দাও কি করে ওর মধ্যে জল থাকে।”

—“ওরাই বুকে নেবে । কেননা জিনিষটা আর কেয়ং পাওয়া যাবে না ।”

মহাদেবের কথাই ঠিক হল । টিনটা সে আর কেয়ং দিল না, হাতে নিয়ে ওহার মুখে এগিয়ে গেল ।

যারা বাইরে গোলমাল করছিল তারা ততক্ষণে চলে গেছে ।

অমর ও মহাদেব সতর্কি বিহিনে তার ওপর “আরাম” করে বসে পড়ল । অমর ঘড়ি দেখে বলল—“বেলা দশটা, আর কতক্ষণ পৃথিবীতে আছি কে জানে !”

মহাদেব পকেট থেকে ছুরি বার করে হাতের নখ কাটতে কাটতে বলল—“ষতদূর মনে হচ্ছে, এরা আমাদের প্রাণে মারবে না ।”

—“ঐ ভাখ তার যোগাড় হচ্ছে” বলে—অমর ওহা মুখটি দেখিয়ে দিলে ।

মহাদেব দেখল, সেই বুড়ো লোকটা বসে বসে পাথরে একখানা বড় দা শান দিচ্ছে, আর লাল ছোট চোখ দুটো তুলে মাঝে মাঝে তাদের দিকে তাকাচ্ছে। লোকটার চাহনির মধ্যে হিংস্রতা ফুটে বার হচ্ছে।

দুজনে আর কোন কথা বলল না। চুপ চাপ বসে থাকতে থাকতে তাদের চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। দুজনেই হাভারস্ট্রাকের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুজনেই অঝোর ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ একটা শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তারা চমকে উঠে বসল,—এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রথমে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। গুহার মধ্যে তখন একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে, বেশ শীতও করছে।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করল—“কি ? ব্যাপার কি ? এত গোলমাল কিসের ? মনে হচ্ছে সকলের মহা আনন্দ হয়েছে।

যে লোকটা তাদের পাহারা দিচ্ছিল, সে তখন বাইরে গেছে। তারা দুজনে স্রোণ দেখে গুহারুখে গিয়ে দেখে, প্রকাণ্ড একটা হরিণ পড়ে আছে। তার চারধারে সকলে আনন্দ করছে।

অমর বলল—“আজ ভোজ হবে।”

মহাদেব বলল—“রাত্রে বোধ হয় নাচ গানও হবে। যদি বেঁচে থাকি দেখে চোখ সার্থক করব—”

এমন সময় সেই লোকটা ছুটে এসে তাদের দুজনকে তাড়িয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

হুজনে অগত্যা আবার সতরঞ্চির ওপর গিয়ে বসল।

অমর ষড়ি দেখে বলল—“বেলা আড়াইটা। এত ঘুমিয়ে ছিলাম।”

মহাদেব বলল—“তোমার ক্যামেরাটি যদি সঙ্গে আনতে।”

“লাভ কি হতো? ভূত হয়ে ছবি নিয়ে কি করতাম? বাইরে কি রকম হট্টগোল শোন। বোধ হয় হরিণটাকে ছাড়ানো হচ্ছে।”

“যদি কিছু অংশও পাই। সঙ্গে লবণ ও গোল মরিচ আছে। মাংসটা কোন রকমে ঝলসে নিয়ে খাওয়া যেতে পারে।”

—“এ অবস্থায় ঐ জিনিষই হবে মোগলাই কারির মত, কিছু কি আর দেবে না?”

মহাদেব হেসে বলল—“সেই আশায় থাক।”

সত্যিই বাইরে তখন হরিণটার ছাল ছাড়ানো হচ্ছিল।

অমর বলল—“এরা লোহা পায় কোথা থেকে? আর সেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র গড়েই বা কেমন করে? কোথাও ত কামারশাল দেখছি না—”

মহাদেব বলল—“এ কথাটা আমিও ভাবছি, মনে হয়, কাছেই এদের আরও জাতভাই আছে। অথবা এরা নিজেরাই ওই পাহাড়ের একধারে বসে আগুন জ্বলে, লোহা পুড়িয়ে, পিটে দা ও বর্শা তৈরী করে। ঢালগুলো দেখা যাচ্ছে চামড়ার। ও চামড়া গুণারের। আজ যেমন দল বেঁধে হরিণ-শিকার করে এল অমনি দল বেঁধে গুয়ারও শিকার করে আনে।”

মধুর পাত্রটা ভখনও তাদের কাছে পড়েছিল, মধুর লোভে মাছি এসে ভয়ানক উৎপাত করছে! অমর মধুর পাত্রটা দূরে সরিয়ে দিতে দিতে বলল—“এই সব পাহাড়েরই কোথাও নিশ্চয়ই লোহা পাওয়া যায়। কি করে লোহা সংগ্রহ করতে হয় তাও এরা জানে। আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে এই সব পিঁচিরে লোহার সন্ধান রাখে—”

—“সে কথা বলা কঠিন। কেন না জিনিষটি এমনই, যে ওর সন্ধান পেলেই কোন না কোন রকমে তার ব্যবহার মানুষ করবেই। এই গুহার মধ্যে তার ত কোন চিহ্নই দেখছি না। ঐ দেখ, ওরা বাইরে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জালুছে—”

পাথরখানার চারিধারে শুকনো পাতা জড় করা। পাথর থেকে আগুনের ফুলকা পড়ে পাতার আগুন ধরিয়ে দিল।

অমর বলল—“এবার ঐ আগুনে হরিণটার মাংস পোড়ানো হবে—”

মহাদেব বলল—“তারপরই ভোজ—”

—“আর সে ভোজে তোমার আমারও নিমন্ত্রণ—

অমর হো হো করে হেসে উঠল।

সাত

পূর্বের রোদ পশ্চিমে সরে গেছে—

বাহিরে আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসে সকলে হরিণটার মাংস, নাড়িভুঁড়ি, লিভার, ফুসফুস প্রভৃতি পুড়িয়ে খাচ্ছে, বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

একজন একখানা পায়ের খানিকটা কলসানো মাংস, ওজনে অন্ততঃ একসের হবে, অমর ও মহাদেবকে দিয়ে গেল, তখনও, এ বেশ গরম আছে, হাত দেওয়া যায় না।

ছাত্তারস্ত্রাকের ভেতর থেকে গোলমরিচ ও লবণ বার করতে করতে অমর বলল—“এরা লবণের স্বাদ জানে না। মহাদেব একটু লবণ দিয়ে আসব কি?”

—“তুমি মনে করছ তার কলে ওরা আমাদের প্রতি খুব সঙ্গর ব্যবহার করবে, তার উন্টোও হতে পারে। দরকার নেই, যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, খেয়ে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক!”

ছুরি দিয়ে মাংসের খানিকটা কাটতে কাটতে অমর বলল—
“এরা যে আমাদের বধ করবেই তার কোন লক্ষণ এখনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যদি সে উদ্দেশ্যই থাকবে, তাহলে ছবার আমাদের খেতে দেবে কেন?”

—“দেখছ ত বলির পাঠাকে ঘাস জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়—”

—“সে যে পাঁঠা—”

—“আর এ যে আমরা মানুষ। যাই হোক, অনেকদিন পরে এমন খাওয়া পাওয়া গেছে। যতটা পারা যায় খেয়ে নেওয়া যাক।”

—“এবং যা খেতে পারব না তা কালার পূরে রাখা যাবে—”

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ করে খেতে লাগল।

এদিকে বেলা পড়ে গেছে। গুহার মধ্যে অন্ধকার হয়ে এল।

মহাদেব বলল—“আজ বোধ হয় প্রাণে বেঁচে গেলাম—”

এমন সময় বাইরে হঠাৎ সোর-গোল পড়ে গেল। ছেলেরে ও বুড়োরা গুহার ভেতর ছুটে এল। যুবক ও প্রৌঢ় যারা ছিল, তারা ছুটে গুহার ভেতর এসে বর্শা ও দা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অমর বলল—“মহাদেব এই মাংসটা ছাত্তারস্তাকে পূরে নাও নীলগির—আমি সতরকিখানা গুহিয়ে নিচ্ছি। পিঠে ছাত্তারস্তাকে বাঁধা। দেখছ এরা সকলে কি রকম ভয় পেয়েছে?”

মহাদেব মাংসটি ছাত্তারস্তাকে পূরে পিঠে ছাত্তারস্তাকটা বেঁধে লাঠি ও বর্শাখানা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

বাহিরে শুধন মহা হট্টগোল। ভেতরে সকলে গুহার কোণে, পাথরের আড়ালে, হাঁড়ির পাশে, মড়ার মাথার তুপের

একধারে জড়সড় হয়ে বসে চীৎকার করছে, গুহার মুখে যারা 'কাড়িয়েছিল তারা কিছু দূরে সরে গেল'।



অমর বলল—এই সুযোগ। চল—আগে ওখানে গিয়ে দেখা যাক—”

ছুজনে গুহার মুখে গিয়ে দেখে, পশ্চিমদার থেকে প্রায়

শুধুই লোক, তারা প্রায় উলঙ্গ, বর্শা, দা, স্বলস্ত মশাল নিয়ে ছুটে আসছে। তাদের গলায় সাদা মালা সম্ভবতঃ হাড়ের, হাতে তাগা তাও বোধ হয় হাড়ের রং কান থেকে কানবালায় যত চামর ঝুলছে। তাদের মাথায় লম্বা চুল।

অমর বলল—“ওরা বোধ হয় এদের গুহা লুণ্ঠন করতে আসছে। এই সময় অবাধে খুনজখম হবে, ওরা এদের ছেলে মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। মহাদেব আমাদের পালাবার এই সুযোগ। এরা এখন আত্মরক্ষার ব্যস্ত। ঐ দেখ দুধারে ব্যহ রোধ করছে। আমরা এই দার দিয়ে নেমে, বাঁ ধারের ঐ জঙ্গলটার মধ্যে যদি ঢুকতে পারি—”

গুহারূখে তখনও জলের বোতলটা পড়েছিল। মহাদেব ভাড়াভাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিলে।

অমর বলল—“ঐ লোকটির গলা থেকে বাইনাকুলারটা যদি নিতে পারতাম। কোন রকমে ওটা ওর গলা থেকে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে না। আর ঐ যে বাইনাকুলার চোখে দিয়ে তাদের দেখছে। ওরা এখনও প্রায় সিকি মাইল দূরে।

আমাদের বাবার সময় এখনও হয়নি। গুহার ভেতরে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়াও মহাদেব—”

দুজনে গুহার ভেতরে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়ালো, দূর থেকে অভিযানকারীদের রণহুকার শোনা যাচ্ছে, এরাও হুকার দিয়ে উঠল।

মিনিট কতক পরে মহাদেব একটু সরে গিয়ে উকি মেরে

দেখে বলল—“অমর ওরা এসে পড়েছে। ঐ শোন পাথর পড়ার শব্দ। দেখেছ কত পাথর জড় করে রেখেছে? ওরা যখন ওপরে উঠবে তখন দিগে ছুঁড়ে মারবে—”

অমর বলল—“যুদ্ধটা দেখবার মত। আমার বোধ হচ্ছে যুদ্ধের সময় আমরা থাকব না—”

—“ঐ দেখ, অমর, এরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গুহার দুধারে দাঁড়ালো। এর মাঝ দিয়ে পালানো কি সম্ভব?”

—“অসম্ভব যা’ তা’ সম্ভব করতেই হবে। দু’দলই হোক তিন দলই হোক পালানো চাই-ই। দেখছ চারধারে পাহাড়ের কালো ছায়া পড়েছে, বেলা ডুবে এল।”

নীচে ততক্ষণে অভিযানকারীরা এসে পড়েছে, তাদের রণ হুকার শোনা যাচ্ছে। গুহার ভেতরে ভয়ানক গোলমাল।

অমর ও মহাদেব আস্তে আস্তে গুহার মুখে সরে গেল। সেখান থেকে নীচের অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

মহাদেব বলল—“জঙ্গল নড়ছে। ওরা বোধ হয় জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ওপরে উঠে আসছে ঐ যে—ঐ যে—”

ঠিক তখনই ওপর থেকে নোঁ করে একটা বর্শা নীচে ছুটে গেল। লোকটা ততক্ষণে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

অমর বলল—“ঐ আবার—দেখ চারধার থেকে উঠে আসছে। ওপর থেকে নীচে পাথর পড়ছে—ঐ আর্ন্তনাদ উঠল।”

মহাদেব অমরের হাত ধরে ভেতর দিকে টানতে টানতে বলল—“সরে এস। ঐ দেখ নীচে থেকেও পাথর ছুড়ছে।”

একটা খারালো পাথর নীচে থেকে এসে গুহামুখে পড়ে ছিটকে ভেতরে অমরের পায়ের কাছে এসে স্থির হয়ে রইল। এরপর দুদলে ঘন ঘন পাথর ছুড়ছে, মাঝে মাঝে বর্শা চালাচ্ছে। হুকারে, আহতের আর্ন্তনাদে, পাথর পড়ার শব্দে কাণ পাতা দায়।

আতি

অমর বলল—“ঐ ওরা কেউ কেউ ওপরে উঠে এসেছে। হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে। যে লোকটির গলায় বাইনাকুলার ঝুলছিল, দায়ের এক কোণে তার মাথাটা কাঁধ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। এরা হেরে যাবে। কিন্তু কি বীরত্ব, কি সাহস! মহাদেব এই গোলমালে—”

“চল।”

তারা দুজনে প্রায় গুহা থেকে বার হয়ে এসেছে...দিন আর নেই। গুহার ভেতর অন্ধকার। শুয়ে কেউ আলো জ্বালেনি এবং তার দরকারও হল না। বিজয়ীদলের মশাল জ্বলে উঠল। তারা বেগে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল।

অমর ও মহাদেব একেবারে দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। ভিড়টার একটু খালি হতেই তারা দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে গুহামুখে সরে গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা জীবিতদের মাথা কাটতে ও

তাদের গা থেকে অলঙ্কার ও পশু চামড়ার পোষাক, মাথা থেকে শিঙ, হাত থেকে বর্শা, দা ও ঢাল কেড়ে নিতে ও মাটি থেকে ঐসব কুড়োতে ব্যস্ত। ভেতরেও লুঠ ও হত্যাকাণ্ড চলেছে।

অমর বলল—“ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এদের মধ্যে দিয়ে ছুটে নীচে নামতে হবে। পারবে?”

—“পারতেই হবে—”

—“তবে ওয়ান-টু-থ্রী—”

শেষের সংখ্যাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুজনে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু যাবে কোথায়? সামনেই একদল সশস্ত্র লোক। তাদের হাতে, গায়ে, বর্শায় ও দায়ে রক্তমাখা, চোখ লাল। তাদের দুজনাকে দেখেই তারা সম্মুখে চীৎকার করে উঠল।

অমর ও মহাদেবের মনে হল, এই তাদের শেষ। ওদিকে ভেতরে যা কিছু পোড়াবার বা আগুন ধরাবার মত ছিল, সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুহার মুখ দিয়ে তার গন্ধ ও ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। হাঁড়ী বা যা কিছু মাটির ছিল, সেগুলো ডাঙার বুম্বাম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে বিজয়ী দল বিজিতদের ছেলেমেয়েদের বন্দী করে বৃকদের হত্যা করে, ঘোঁকাদের মাথা কেটে নিয়ে লুটের জিনিষ যত কাঁখে তুলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে।

অমর ও মহাদেবের সৌভাগ্য যে তারা তাদের হত্যা করল

না, আর সকলের সঙ্গে বন্দী করে পাহাড় থেকে নামতে লাগল।

অমর বলল—“বাঘের মুখ থেকে এবার কুমীরের কবলে পড়া গেল—”

মহাদেব বলল—“এবার আর রক্ষা নেই—”

—“সেবারও রক্ষা ছিল না।”

পাহাড় থেকে নামতে নামতেই চারখার গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। বিজয়ীদের সঙ্গে যে মশালগুলো ছিল সে গুলোর কয়েকটা নিভে গেছে, কয়েকটা জ্বলছে। তাদের আলোয় পথ দেখে সকলে চলেছে।

প্রথমে ও শেষে বিজয়ীর দল, মাঝখানে বন্দীরা। আলোয় বিজয়ীদের বর্শার কলা ও দায়ের খারালো মুখ এক একবার কক্ কক্ করে ওঠে।

বন্দী ছেলে-যেদের যেরে ছেলেদের পিঠে ও কাঁধে করে নিয়েছে, কেউ কেউ হেঁটে চলেছে।

মহাদেব বলল—“অমর, এদের মাঝ থেকে ছুটে পালানো যায় না—”

অমর হাতারস্তাকটা পিঠের এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল—“তা বোধ হয় যায়। কেন না আমাদের কাছে ত কোন পাহারা নেই, সামনে ও পিছনে—
আছে—”

—“কি রকম? তোমার বত আছে? আমাদের তামো

যে কি আছে জানা যাচ্ছে না। এই সব ছেলে ও মেয়েদের
মিয়ে এরা কি করবে কে বলবে। এদের মাংস খাবে কি
এদের দিয়ে শিকারের দলপুষ্টি করবে তার ঠিক নাই—”

—“এদের বেচেও দিতে পারে। আমি শুনেছি, এই
অঙ্গলে এখনও নাকি দাস ব্যবসা চলে—”

—“এ সব দাস কেনে কে ?

—“সত্য বলে পরিচিত এমন অনেক লোক আছে—”

—“তাহলে এদের সঙ্গে সত্য জগতের সম্বন্ধ আছে
বল ?”

—“সরাসরি হয়ত নেই। আমার যতদূর মনে হয়, এদের
কোন কোন শাখা সত্য-জগতে মেশে। তারাই এই স্থানিত
কাজের সহায়। পাঁচশ বছর আগের পৃথিবী, আর পাঁচশ
বছর পরের পৃথিবীতে তফাৎ তের এমন চারখারে সত্যজাতির
বাস। এদের মধ্যে যদি কোন অসত্যজাতি থাকে তাহলে
তারা নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে সত্য জগতের সংস্পর্শে
আসবেই। আর—”

—“তোমার বক্তৃতা এখন রাধ অমর। কি করে পালানো
যায় সেই পরামর্শ করা যাক—”

অমর বলল—“এর মধ্যে পরামর্শের কিছুই নেই। কথাটা
খুবই সোজা। আন্দাজে মনে হচ্ছে আমরা প্রায় এক মাইল
চলে এসেছি। ক্রমতারা দেখে যাবণা হয় ; যাচ্ছি পশ্চিম
দিকে। পশ্চিম দিকে হাঁ—পশ্চিম দিকেই। আর কত মাইল

যেতে হবে জানি না, সেখানে গিয়ে দেখব ওদের মশালগুলো নিভে এসেছে—”

—“বুঝেছি। সেইখানে অন্ধকারে সরে পড়তে চাও। কিন্তু যদি নতুন মশাল জ্বালে?”

—“যদি জ্বালে, আর পালাতে পারব না—”

অমরের স্বরে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই, যেন উদাসীনশূভরা।

মহাদেব তার এ ভাব লক্ষ্য করে বলল—“তোমার কি হয়েছে বলত?”

—“বিশেষ কিছু নয়। ভাবছি, আজকের ঘটনাটা আর অসহায় ছেলেগুলো ও স্ত্রীলোকদের কথা। কি নৃশংস এরা। ঐদেখ, ওদের হাতে ছিন্নমুণ্ডগুলো—”

মহাদেব বলল—“নিতান্ত সত্য বলে যারা জগতে পরিচিত, বুকের সময় তাদের হিংস্র ব্যবহারটিও দেখেছ ত? তবে এদের ব্যবহারে বিচলিত হও কেন? এরা ত অসত্য—”

অমর তার কথার উত্তর দিল না, চুপ কোরে চলতে লাগল। একবার কেবল মশালের মৃদু আলোকে হাত বাড়িটা দেখে মিল।

তারপর তারা সকলে আরও মাইল দুই পার হয়ে এল। বিজয়ীদের মশালের আলো আরও নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে, আলোর চেয়ে এখন ছায়া পড়ছে বেশী।

অমর বলল—“দূরে—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না—”

মহাদেব সেদিকে তাকিয়ে বলল—“হাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে—”

—“আমার মনে হয় ওটা এদেরই এলাকায় বসছে। এরা

ঐ দিকেই যাবে। এবার প্রস্তুত হও। এদের মশালগুলোর আর একটু নিভে এলে—”

যে কয়টি মশাল জ্বলছিল তার দুটি ঠিক তখনই নিভে গেল।

অমর বলল—“সামনে জ্বলছিল চারটে, এখন বাকী রইল দুটো—”

মহাদেব পিছন ফিরে দেখে বলল—“পিছনে জ্বলছে মোটে একটা। তাও নিভে এসেছে—”

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই পিছনের মশালটা নিভে গেল, কিন্তু দেখা গেল, সামনে দূরে যে আলোটা জ্বলছিল, সেটা হয়ে উঠেছে আরও উজ্জ্বল ও বড়। সেই সঙ্গে এদিকে-ওদিকে আরও আলো দেখা যাচ্ছে।

অমর বলিল—“ওরা বোধ হয় বিজয়ীদের সম্বর্ধনা করতে এগিয়ে আসছে। মহাদেব এই সুযোগে এই অস্পষ্ট আলোয় ডানধারে—প্রস্তুত—?”

মহাদেব হাতারশ্যাকটাকে পিঠের মাঝখানে ঠেলে দিয়ে বলল—হাঁ—ওয়ান—”

অমর বলল—“টু”

মহাদেব বললে—“থ্রী—ই—ই—ই—ই—”

ছুট—ছুট—ছুট—

তাদের পাশে কি যেন এসে পড়ল। পিছনে সকলে চীৎকার করছে, মনে হচ্ছে অনেকে ছুটে আসছে।

উঁচু নীচু মাঠ, তার ওপর অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে দুজনেই
দুবার পড়ে গেল, তার কলে হাত দুখানা ছেড়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে অমর বলল—“দুজনে ত্র্যাকটে কার্ট হব—
ও—কি”

মহাদেব ছিল পিছনে। সে একবার কিরে দেখল। কৈ
কিছুই ত দেখা যায় না। দূরে ঐ যে দুটো মশাল জ্বলছে—
মনে হচ্ছে ওরা ঝাড়িয়েছে।

এসময়ে এক মুহূর্তও থেমে থাকা বিপদের। অনবরত
ছুটতে হবে।

ভারাও সামনে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে মাইল ধামেক
এসে আবার দুজনে কিরে দেখল ঐ যে মশাল জ্বলছে মনে হচ্ছে
যেন একটু একটু সরে যাচ্ছে।

তবুও কেউ তাদের পিছনে আসছে কিনা জানবার জন্য
অমর সেখানে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মাটির সমান্তরালে
চারদারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মহাদেবও লম্বা ছুরিখানা মাটিতে পুঁতে তার হাতলে কান
দিয়ে শুন্তে লাগল।

না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, বা কেউ আসবার কোন শব্দও
শোনা যাচ্ছে না। বরং বোধ হচ্ছে, একটা শব্দ ক্রমে দূরে
মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধ

ঘোর অন্ধকার—

অমর বলল—“মহাদেব এবার তোমার টর্চটা জ্বালো ।”

মহাদেব হাভারস্কা থেকে টর্চ বার করে জ্বালল ; তারপর বলল—“বাঘের মুখ থেকে কুমীরের কবলে পড়েছিলাম, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে এবার কোথায় পড়েছি ?”

অমর বললে—“জলে—”

“কিন্তু ডাঙায় না উঠলে কি রক্ষা পাওয়া যাবে ? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শীতে কোথায় যাব ? যে কোন মুহূর্তেই ত কোন হিংস্র জন্তুর সামনে পড়তে পারি—”

—“তবুও যতটা পারা যায় হাঁটা যাক । ঐ দেখ ওদের মশালটা কত ছোট হয়ে এসেছে । যদি আন্তানা থেকে সকলে আমাদের সন্ধানে বার হয়, তাহলে এবার আর, রক্ষা থাকবে না...আরে দাঁড়াও মহাদেব । ঐ দেখ সামনে কি ?”

টর্চের তীব্র আলো সামনে একটা টিপির ওপর পড়েছিল । সেই আলোতে তারা দেখলে তার ওপরে দুটো চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে আছে ।

তাদের চোখে টর্চের আলো পড়ায় তারা চোখ বন্ধ করেছে যাত্র, ওঠবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না ।

আসামের জঙ্গলে

অমর ও মহাদেব স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়ালে। আর এক
পা নড়তেও তাদের সাহস হ'ল না।



মহাদেব বলল—“চিতাবাঘ ছটো পরম নিশ্চিত মনে বসে
। আছে, নড়বার সাহসও করছে না যে—”

কি উত্তর দেবে অমর ভেবে গেল না। ওদের মতলব কি ?

আক্রমণ করবে ? তা যদি হয়, এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া কোনটিতেই রক্ষা নেই।

মহাদেব আবার বলল—“এবার সত্যিই বড় মুন্সিলে পড়া গেল—”

অমর কতকটা নিজেকে সাহস দিয়ে বলে উঠল—“সব চিতাবাঘ মানুষ খায় না, এস এক সঙ্গে দুজনে চীৎকার করা যাক। চীৎকার শুনে বাঘ দুটো উঠে যেতে পারে—”

অমরের চেয়ে মহাদেবের গলার জোর অনেক বেশী। দুজনে একসঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার শুরু করল।

আলো দেখে যারা ওঠে নি, মহাদেবের বাজুখাই গলার আওয়াজে তারা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে একলাকে টিপিটার ওধারে নেমে গেল।

মহাদেব বলল—“তবুও মনে হচ্ছে, ওরা খুব দূরে সরে যায় নি—”

“না যাক, চল, ঐ সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখা যাচ্ছে, ওর ওপর উঠে বসিগে—”

গাছটির পাতার ওপর টেঁচের আলো পড়েছিল। দুজনে তার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল।

তার কাছ থেকে তারা তখনও হাত পঁচিশেক দূরে হঠাৎ গাছটার ডাল-পালা সর্ সর্ শব্দে ছলে উঠল। সে শব্দে তাদের পা আপনা থেকেই থেমে গেল।

দুজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টচের স্তম্ভী আলো তার ডাল-পালার ওপর গিয়ে পড়েছে।
গাছের ডাল-পালাও ধামেনি, তখনও ঘন ঘন দুলাচ্ছে। মনে
হচ্ছে, কোন প্রাণী বা মানুষ এডাল থেকে ওড়ালে যাচ্ছে।

অমর বলল—“চল—আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক।
সেদিন ভাল্লুককে তাড়িয়ে তার গুহার রাত কাটিয়েছি। আজও
যদি পারা যায়—”

তারা দুজনে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। গাছটা থেকে
হাত দশেক দূরে গিয়া পৌঁছতেই অমর বলল—“ঐদেখ চোখ,
ঐদেখ হাত পা—”

মহাদেব দেখল গাছের ডালে টচের আলোর দুটো চোখ
চক্ চক্ করছে, সাদা হাত পা দেখা যাচ্ছে—

জিজ্ঞাসা করলে—“ওটি কি বল ত? মানুষ? না, বানর
—বানর—”

অমর বলল—“ঐষে আর একটা ওর ওধারে আলোর দিকে
পিঠ ফিরিয়ে সরে বসল—”

এবার দুজনেরই সাহস হয়। তারা গাছটার একবারে
ডলায় গিয়ে ওপর দিকে চারিধারে টচের আলো ফেলতেই
দেখল আরও কয়েকটা বানর বসে আছে।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করল—“ওরা বানর কিন্তু লেজ কৈ?”

দৃশ্য

অমরের মনে পড়ল, এ সকল জায়গায় উল্লুকের বসবাস আছে। উল্লুক লাস্কুলহীন বানর, মানুষের জাতি। বোধ হয় চার জাতীয় বানরের মধ্যে ওদের সঙ্গেই মানুষের সম্বন্ধটা বেশী। সে বলল—“ওগুলো উল্লুক, তোমার-আমার জাতি। কিন্তু সে সম্বন্ধ ওরা ত স্বীকার করেই না, আমরাও, যাতে না স্বীকার করতে হয় তার নানা চেষ্টা করি। এ অবস্থায় ও গাছটাতে না ওঠাই নিরাপদের—”

—“তবে চল ঐ গাছটাতে ওঠা যাক—”

দুজনে দূরের গাছটার তলায় গেল। কিন্তু সেখানেও শাখাবাসীদের ভিড়।

মহাদেব বলল—“কি করা যায়? ঐ যে একটা ছোট গাছ দেখা যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে একবার চেষ্টা করা যাক, যদি আশ্রয় মেলে—”

দুজনে সেই ছোট গাছটার তলায় গিয়ে টর্চের পরীক্ষা করল।

অমর জিজ্ঞাসা করল—“কিছু দেখতে পাচ্ছ?”

—“ভাঙ্কে এস ওঠা যাক—”

কিন্তু ওটা তত সহজ হল না। নীচে কোন ডাল নেই, ওঁড়িও খুব মোটা।

অমর বলল—“মহাদেব, তুমি আমার কাঁধে ওঠে—”
—“তারপর তুমি ?”

—“ট্রাপিজের খেলা ভুলে গেছ ? নীচের ঐ মোটা ডালে বাহুড় ঝোলা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে, আমি তোমার হাত ধরে তারপর গাছ বেয়ে ওপরে উঠব। বুঝচ না এটা যে আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের এলাকা। এককালে আমরাও শাখাবাসী ছিলাম। গাছে ওঠবার কিছু কৌশল এখনও আমরা ভুলিনি—”

মহাদেব আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তার পরই বলল—“ও কিসের শব্দ শীগগির শীগগির কোন হিংস্র জন্তু—”

আর চট করে তার হাতারস্তাকটা পিঠ থেকে খুলে মহাদেবের হাতে দিয়ে বসে পড়ল ; মহাদেব সেটা নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে তার কাঁধে উঠতেই অমর সোজা হয়ে উঠে ঝাড়ালো।

শব্দটা ততক্ষণে আরও কাছে সরে এসেছে।

মহাদেব গাছের মোটা ডালটা ধরতে ধরতে বলল—“এ যে মোষের ডাক—বুনো মোষের পাল বেরিয়েছে—”

যেদিকে থেকে ডাকটা আসছিল, সেদিকে টর্কটা ঘুরিয়ে অমর বলিল—“শীগগির—মহাদেব—শীগগির—”

মহাদেব হাতারস্তাকটা তাড়াতাড়ি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে মোটা ডালটা পারে বাধিয়ে বাহুড়ের মত ঝুলে পড়ল। অমর টর্কটা পকেটে পুরে স্ত্রীংয়ের মত পর হাত ছুঁষা না লাকিয়ে ধরে তার গায়ের ওপর ঘুর পাক দিয়ে মোটা ডালটি

চেপে ধরলে। তাদের লাঠি দুখানা ও বর্শাখানা নীচে রইল পড়ে।

সে গাছে উঠে বসতেই সুরের মটামট আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল।

দুজনে আর একটু উঁচু ডালে উঠে গিয়ে নীচের আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকে টর্চটা ঘুরিয়ে দিল। সে আলো বহুদূর অবধি চলে গেল। সম্ভবতঃ সেই আলো দেখেই মহিষের পাল অন্য পথে ফিরে ছুটতে লাগল। শেষে আর তাদের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না।

নিস্তরু বনভূমি ঝাঁ ঝাঁ ডাকছে, জোনাকী উড়ছে, মাঝে মাঝে উল্লুকদের নড়াচড়ায়, গাছের ডালপালা সরসর করে ওঠে, এক, একবার পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়, দূরে শিয়াল ডেকে উঠল, কোথায় যেন চিতাবাঘ ডাকছে।

তারা দুজনে চুপ করে গাছের ডালে বসে রাত্রিশেষের প্রতীক্ষা করছে।

শীতে হাত-পা জমে আসছে, ঘুমে চোখ ভারি হয়ে উঠছে। কিন্তু এক মুহূর্তও চোখের পাতা বন্ধ করবার উপায় নেই। একটু ঘুমোলেই পতন ও মৃত্যু।

এমনভাবে প্রহরের পর প্রহর যেতে লাগল।

শেষে হঠাৎ এক সময় পাখী ডেকে উঠল।

দুজনে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখে পূর্বদিক কসাঁ হয়ে এসেছে।

মহাদেব বললে—“নামো ।”

অমর বললে “আর একটু ফর্সা হোক, এখনও কিছু ভাল চোখে দেখা যায় না, গাছের তলার অন্ধকার ।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে অন্ধকার দূর হ’য়ে গেল অমনি বনভূমি প্রকম্পিত করে উল্লুকের দল সমস্তরে চীৎকার জুড়ে দিলে হুঁকু, হুঁকু, হুঁকু—

অমর বললে—“এবার শুধু নামা নয়, যত শীগগির পারা যায় পালানো যাক । এ গান শোনবার মত শক্তি আমার নেই—”

দুজনে একসঙ্গে গাছ থেকে নেমে লাঠি দু’খানা ও বর্শাটা নিয়ে রওনা হল ।

সামনে একটা ছোট জলা—

তার ধার থেকে লম্বা ঘাসের বন, প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে আছে । তারপর বন, বনের শেষে এক সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে ।

তখন রোদ উঠেছিল । জলার ধারে একটা পাথরের ওপর বসতে বসতে অমর বলল—“মহাদেব, বহুদিন স্নান হয়নি । আজ স্নান করে নেওয়া যাক ।”

মহাদেবও তার পাশে বসে বলল—“আমিও সেই কথাই ভাবছি । এইখানেই স্নান, পান আর ভোজন করতে হবে । এরই জল বোতলে পুরে নেব । যা দেখছি, এবার আমাদের পথ বনের ভেতরে দিয়ে ।”

আগামের জঙ্গলে

হু'জনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সেই জলাশয়ে স্নান করে
নিল। তারপর তার তীরে বসে সঙ্গে যেটুকু ঝলসানো মাংস



সেটুকু কোন রকমে পেটে পূরে, বোতলেও চায়ের ঠিলে জল
ভরে ঘাসবনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।

অমর বলল—“এরকম জায়গায়ই বাঘ থাকে, মহাদেব—”

—“কিন্তু এ পথ দিয়ে ছাড়া ত যাবার উপায় নেই। আমরা ঠিক পশ্চিম দিকে চলেছি ত ?”

—“মনে হচ্ছে তাই। এবার যদি কোন লোক দেখি, তাহলে আর পালাব না, হয় তাকে মারব, না হয় নিজে মরব।”

“অন্ততঃ আধমাইলের মধ্যে সে আশঙ্কা আছে বলে মনে হচ্ছে না—”

হুঁজুনে চুপ করে চলেছে। ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে হাওয়া বইছে। শব্দ হচ্ছে—শোঁ—শোঁ—শোঁ—। গাছগুলো বাতাসের ভরে এক একবার সুরে পড়ছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারা সে জায়গা পার হয়ে বনে গিয়ে ঢুকল।

গাছে গাছে নুতন পাতা, তলায় শুকনো পাতার রাশি। কোন কোন গাছে ফুল ফুটেছে।

সারাদিন পথ চলে তারা শেষ বেলার দিকে হঠাৎ একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলো।

হুঁজুনেই অবাক! নদীটা বেশী চওড়া নয়, কিন্তু জল বেশ গভীর মনে হচ্ছে, স্রোতও প্রবল।

মহাদেব তার তীরে একটা গাছ তলায় বসে পড়ল। অমর তার পাশে ঝাড়িয়ে। ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—“মহাদেব, আজ আরও হাঁটতে চাও ?”

মহাদেব গাছের গুঁড়িটার হেলান দিয়ে বলল—“না। এই

গাছে উঠে আজ রাত কাটাবো। আমার মাথায় এক মতলব আসছে অমর—”

—“কি ?”

—“যদি কোন ভেলা তৈরি করা যায়, তাহলে তাতে কিছু দূর যাওয়া যেতে পারে। নদীর স্রোতটাও ত চলেছে উত্তর মুখো—”

—“এটা বড় আশ্চর্যের। দক্ষিণে সমুদ্র। প্রায় সব নদীই দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়। এটা উত্তরে যাচ্ছে কেন ?”

—“বোধ হয় আবার ফিরে যাচ্ছে—”

অমর হেসে উঠল ; তারপর বলল—“যতদূর মনে হচ্ছে এটা কোন বড় নদীর করদ নদী। নদীটা তার দিকে ছুটে চলেছে। তোমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু তা কাজে খাটানো যাবে না। কি দিয়ে ভেলা তৈরি করব ?”

মহাদেব কথাটা মনে মনে ভাবতে লাগল। কিন্তু শেষ অবধি তার মতলবটা কাজে খাটাবার মত কোন উপায় খুঁজে পেল না।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল।

অমর বললে—“এই বেলা গাছে ওঠ মহাদেব। সন্ধ্যাবেলা বনের নদী বড়ই ভয়ঙ্কর। এখনই নানা প্রাণী জলপান করতে আসবে—”

দু’জনে সেই গাছটার ওপর চড়ে বসল। ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে রাত এল। রাতও বেড়ে চলল—

মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দু' একটা পশুর ডাক শোনা যায়, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কি যেন চলতে চলতে ধমকে দাঁড়ায়, একবার কি যেন চক্‌চক্‌ শব্দে নদী থেকে জলপান করতে লাগল। দুজনে কান খাড়া করে সজাগ হয়ে চুপ করে গাছের ডালে বসে আছে।

অবশেষে রাত শেষ হল, পাখী ডেকে উঠল, পূর্বদিক করসা হয়ে এল।

তারপর নদীর জলে আর বনের তলায় দিনের আলো পড়তে তারা গাছ থেকে নেমে জলে হাত-মুখ ধুয়ে, পেট পূরে জল পান করে নদীর তীর ধরে চলতে লাগল।

বেলা তখন একটা। অমর বলল—“মহাদেব আমরা সকাল থেকে অন্ততঃ মাইল পনেরো হেঁটে এসেছি। নদীটাও প্রায় উত্তর দিকেই চলেছে।” তার পর হঠাৎ কান খাড়া করে বলল—“শুনতে পাচ্ছ ? কান্নার শব্দ ?”

—“কান্নার শব্দ ?”

—“হাঁ—কান্নার শব্দ। পিছন দিক থেকে আসছে—” ব'লে অমর পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

মহাদেবও তার সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়েছিল ; সে বলল “ঐ যে নৌকো আসছে—নৌকো—”

দুজনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো খানার দিকে তাকিয়ে রইল।

নৌকোখানা দাঁড় টেনে ও স্রোতের টানে ছুটে

আসছে, তার মাঝি মাল্লারা ও তাদের ছ'জনকে দেখতে পেয়েছিল।

অমর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—“ঐ দেখ মহাদেব পরশুর সেই ছেলে ও স্ত্রীলোকগুলো! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের। ঐ যে ওরা কাঁদছে—”

মহাদেব বলল—“এরা ত সেই লোকগুলো নয়। এরা অন্য। পোষাক, চেহারা সবই তাদের থেকে তফাত। এই মাঝি—এই—এই—দাঁড়াও—”

মহাদেব ও অমর হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকতে লাগল। কিন্তু মাঝি নৌকো কূলে ভিড়ানো দূরে থাক, দাঁড়িদের জোরে দাঁড় টানতে উৎসাহ দিতে লাগল।

তারা ছ'জনে সমস্বরে টীৎকার করছে। কে কার কথা শোনে? নৌকোখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

অমর বললে—“নিশ্চয়ই কাছে মানুষের বসতি আছে। আর তারা নিতান্ত অসভ্য নয়। আজ আমাদের কপালে কোন খাতিই জুটবে না। চল, যদি কোথাও আশ্রয় পাই—”

কিন্তু সারাদিনেও তাহারা কোন বসতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারল না। অগত্যা নদীর জল পান করে রাতের যত গাছে আশ্রয় নিল।

পরদিন আবার চলেছে। কিন্তু আজ যেন তাদের উৎসাহ কম, শরীর কিছু দুর্বল। সেই জন্তু চলার বেগ নিতান্ত অল্প।

আসামের জঙ্গলে

প্রায় একমাস তারা বনে জঙ্গলে অনাহারে অর্ধশয়নে ও অনিদ্রায় কাটিয়েছে এবং সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে আসছে, শরীর সেজগে শক্তিহীন।

সেদিন দুপুরের দিকে মহাদেব বলল—“অমর, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি। যতদূর মনে হচ্ছে, আজ আর চলতে পারব না—”

অমরের মুখ শুকিয়ে গেল, সে বললে—“আর একটু গেলে, হয়ত কোন বসতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারা যেত—”

মহাদেব লাঠির দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে চলতে—
“আচ্ছা—”

কিন্তু প্রতি পায়ে মনে হতে লাগল, সে আর পারে না।
তবুও মাইল ধানেক গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল।

অমরও কতকটা নিরাশে, ভয়ে ও কতকটা শারীরিক দুর্বলতার তার পাশে ধীরে ধীরে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে অচ্যু দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—“মহাদেব—”
কোন সাড়া নেই।

অমরের শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মহাদেব
গাছে হেলান দিয়ে বসেছিল।

সে কিরে দেখে মহাদেবের মাথাটা বুকের দিকে মুয়ে
পড়েছে। সে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে দিতে ভীত কণ্ঠে
ডাকল—“মহাদেব—মহাদেব—”

আসামের জলে

মহাদেবের দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অমর তাড়াতাড়ি নাকে হাত দিয়ে দেখল নিশ্বাস পড়ছে, বুকে হাত দিয়ে দেখল, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে। সে জলের বোতলটা বার করে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। এমন সময় শুনল, তার পিছনে কারা যেন কথা বলছে। ফিরে দেখে, জন চারেক লোক। তাদের হাতে তীর ধনুক বর্শা এবং গায়ে জামা কাপড়। লোকগুলো অর্ধসভ্য বলে মতে হতে লাগল।

তারাও তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

অমর তাদের কথা না বুঝেই হাত দিয়ে মহাদেবকে দেখতে লাগল।

একজন লোক তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্রেকারের মত জিনিষ এনে মহাদেবকে তার ওপর তুলে নিয়ে অমরকে সঙ্গে যেতে ইসারা করল।

সেখান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে নদীর ধারে একটা বসতি। বাড়িঘর সব খড়, চাটাই ও বাঁশের। সেখানে যারা বাস করে তারা অনেক সভ্য।

যাহোক অমরের সে ঘরের দিকে তখন দৃষ্টি ছিল না। তার একমাত্র চিন্তা মহাদেবের জীবন।

লোকগুলোর চেষ্টার সৌভাগ্য বশতঃ মহাদেব দুদিনের মধ্যেই কতকটা সুস্থ হয়ে উঠল।

আসামের জঙ্গলে

তারপর তারা একদিন তাদের দুজনকে ছোট নৌকায় করে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে রেখে চলে গেল।

তারাও সেখান থেকে কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে সকলের দুশ্চিন্তা দূর করল।

এর পর যদি কেউ অমরকে জিজ্ঞাসা করত—“পিশাচের দেশ থেকে কি সংগ্রহ করেছ অমর?”

অমর উত্তরে বলত—“অভিজ্ঞতা। মূল্য দিতে তোমরা পারবে না—।”

শেষ

ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার মত উপহারের বই

- | | |
|--|----|
| ১। অরুণের মোতুস কীর্তি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১১ |
| ২। গুপ্ত মন্ত্রের জালে—সত্যচরণ চক্রবর্তী | ১১ |
| ৩। রহস্যের ইন্দ্রজাল—অ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তী | ১০ |
| ৪। শিশুদের বিবাহ-লিঙ্গু—কবি বন্দে আলী মিক্স | ১০ |
| ৫। সোণার হরিণ—কবি বন্দে আলী মিক্স | ১০ |
| ৬। এ যুগের দৈত্য—শ্রীহারাণন্দ চট্টোপাধ্যায় | ১০ |

এন্স, এন্স, পাল এন্স কোং।

২০০২এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসামের জঙ্গলে

এক

আজ থেকে পনেরো বৎসর আগে একদিন—
একখানা বাঙলা দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত
হয়েছিল—

নিরুদ্দেশ—

“গত বড়দিনের ছুটির একদিন আগে দুইটি ছেলে দেশ
ভ্রমণে বাহির হয়। তা’দের একটির নাম অমর মিত্র, আর
একটির নাম মহাদেব রায়।

অমরের বয়স আঠারো বৎসর। তার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ,
কপাল চওড়া, চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, নাকটি তীক্ষ্ণ,
মুখখানি লম্বা, থুংনিতে একটি কাটার দাগ আছে, গায়ের রঙ
উজ্জ্বল শ্যাম।

মহাদেবের বয়স ষোলো বৎসর। তারও শরীর বলিষ্ঠ
কিন্তু দীর্ঘ নয়, মুখখানা গোল, চোখ দুটি বড়, নাকটি মোটা,

গায়ের রঙ কালো, কতকটা পোড়া লোহার মত, তাহার বাম হাতের তর্জ্জনীর একটি কর নাই।

দুজনেরই পরিধানে ছাই রঙের হাকপ্যান্ট, পায়ে জুতা-মোজা, গায়ে ফ্রানেলের সার্ট ও মোটা পশমী কোট, গলায় মাফলার, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ছেলে দুটি দশদিনের কড়ারে বাড়ি হইতে বাহির হয়। কিন্তু একমাস কাটিয়া গেল এখনও কিরিয়া আসিল না। ইহাতে মনে হয়, তাহারা ইঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় বা বিপদে পড়িয়াছে।

কেহ যদি তাদের সন্ধান দিতে পারেন, তাকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিব।”

ষেদিন সকালে বিজ্ঞাপনটি বার হ'ল, সেদিন তখন অমর বল্ছে—“মহাদেব, কালকের রাতখানা কেটেছে গাছের ডালে—”

মহাদেব ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করল—চুপ্। তারপর কাটা তর্জ্জনীটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেখালে একটি বড় ও ঝাঁকড়া গাছের নীচে অন্ততঃ ত্রিশটা মড়ার মাথা ওপর ওপর সাজানো। তার সামনে একটি মানুষ—মানুষ? হাঁ, মানুষই বটে। কিন্তু তার চেহারা দেখে, দুজনেরই প্রথমে বিশ্বাস হল না যে সে মানুষ।

মানুষ কখনও এত কুৎসিত, এমন ভীষণ দর্শন হয়? তার গায়ের রঙ কাল, চোখ দুটি লাল, নাকটা মোটা, গলায় হাড়ের মালা, হাতে হাড়ের তাগা, কানে হাড়ের কর্ণাভরণ, ঠোঁট

দুখানা একটু পুরু, পরিধানে সামান্য আচ্ছাদন। তার পাশে গাছের গায়ে দুটো স্তূতীক্ক বর্শা হেলানো রয়েছে।

তারা দুজনে একখানা পাথরের আড়ালে ঠাঁড়িয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করছিল। আর একটু অপেক্ষা করলে হয়ত



ভাল করে সব দেখা যেত। কিন্তু অমর হঠাৎ মহাদেবকে একটি খাকা দিয়ে সরিয়ে নিজেও এক লাফে সেখান থেকে সরে গেল।

তাদের কাছ থেকে হাত চার পাঁচ দূরে একটা অঙ্গল

মরার মত পড়ে আছে। তার পেটটা মোটা, হয় হরিণের বাচ্চা, নয় খরগোশ, এমনই ধরণের কোন ছোট-খাট প্রাণী গিলে পড়ে পড়ে হজম করছে।

সেখান থেকে হাত কুড়িক নীচে একটি জঙ্গল। বন সিউলী, চারা বেল, কাঁটা লতা ইত্যাদিও তাদের মাঝে মাঝে দুটো চারটে শাল, পলাশ, আমলকী প্রভৃতি চেনা-অচেনা বড় গাছ রয়েছে। দুজনে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নেমে জঙ্গলটার ধারে এসে দাঁড়ালো।

মহাদেব বলল “এভাবে যে এখানে এসে পড়ব কে জানত ?”

লোহা বাঁধানো বাঁশের লম্বা লাঠিখানার আগা দিয়ে একখানা পাথরকে আন্তে আন্তে খোঁচা মারতে মারতে অমর বলল—“কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তখন জায়গাটি ভাল করে দেখে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরব—”

—“সে ত’ পরের কথা। হয়ত দেখা হইবে। বাড়ি আর ফিরতে পারব না—”

অমর বলল—“আমরা কোথায় এসেছি বলতে পার ?”

মহাদেব একটু ভেবে বলল—“যতদূর মনে হয়, একেবারে আসামের সীমান্তে এসে পড়েছি। এর পরেই ব্রহ্মদেশ।”

—“মগের মূলুক ?”

—“কেবল মগের মূলুক নয়, বাঘের মূলুকও—”

—“দেখ-দেখ, সামনের জঙ্গলটি নড়ছে না ?”

—“হাঁ, তাইত। ঐ ওপরদিকে কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে?”

অমর উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল—“বাঁদিকে একটি সরু পথ দেখা যাচ্ছে, লীগগির ঐদিকে চল—”

সেদিকে যেতে হলে কতকগুলো পাথরের ওপর দিয়ে যেতে হয়। সমতলবাসী লোকের পক্ষে তার ওপর দিয়ে যাওয়া কঠিন, কিন্তু এই কুড়িদিনে পার্বত্য পথ তাদের কাছে অনেক সহজ ও সরল হয়ে এসেছে। দুজনের পিঠে দুটো হাভারশাক ভরা জিনিষ-পত্র। তারা তাই পিঠে নিয়েই পাথরগুলোর ওপর দিয়ে পথে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর সেখান থেকে দেখল ওপরে সেই মানুষ-পিঁপাট খানিকটা নীচে নেমে এসে একটি পাথরের ওপর ঝাড়িয়ে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দুহাতে লম্বা দুখানা বর্শা।

অমর বলল—“ওকে ধরাশায়ী করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু ওর হাতের ওই বর্শা—”

—“সামাল অমর,” বলেই মহাদেব হঠাৎ অমরের হাত ধরে নীচের দিকে একটা টান দিয়েই পাথরের আড়ালে চট করে বসে পড়ল।

তার পাশে অমরও বসেছে। আর সেকেও কয়েক দেবী হলেই সে বর্শাবিক্ষ হয়ে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করত।

সে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে সোঁ করে একটা বর্শা এসে হাত কতক দূরে সামনের পাথরের গায়ে লেগে ছিটকে ধানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল। ঐ যে পাথরখানা গর্ত হয়ে গেছে।

অমর বলল—“খুব জোর বেঁচে গেছি। এবার বুঝেছি লোকটা কে। ওরা হল হেড হানটার। মানুষের মাথা সংগ্রহ করে বেড়ায়।”

—“আমি বলব পিশাচ কিন্তু এখানে কতক্ষণ—”

অমর পাথরখানার পাশের দিকে বসে ছিল; বলল—
“সর্বনাশ, ও যে বাঘের মত গুঁড়ি মেরে নেমে আসছে। ঐ বর্শাটা যদি কোন রকমে কেড়ে নেওয়া যায়, তাহলে ওরই মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আমি হেড গ্রাইনডার হব।”

মহাদেব দুহাতের ওপর ভর দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখেই চট করে একখানি সের দুয়েক ওজনের ধারালো পাথর তুলে নিয়ে বলল—“অমর, তুমি ঐ ছোট পাথরটা তুলে নিয়ে বাঁ ধারে ছুড়ে দাও শীগগির—”

—“কেন?”

—“পরে বলব। আগে বাঁচি—”

অমর তৎক্ষণাৎ একখানা পাথর তুলে নিয়ে বাঁ ধারে ছুঁড়ে দিল।

মহাদেবও চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপরই সে তার হাতের ধারালো পাথরখানা সামনের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল “হুম্ ওঁ, ওঁ—”

মহাদেব একলাকে পাথরখানার আড়াল থেকে বাইরে দিয়ে দাঁড়াল, আবার একখানা পাথর কুড়িয়ে নিল।

অমর তার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখে, কিছু দূরে পিশাচটা কাত হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে ; তার মাথার একপাশ থেকে রক্ত বার হচ্ছে। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তার হাতের বর্শাখানা এক টানে কেড়ে নিলে।

সেই দিনই দুপুরের দিকে—

সামনে কয়েকটা বুনো কমলালেবুর গাছ। গাছ ভরে ফল ধরেছে। কোন কোন ডালের পাতা দেখা যায় না। ফল গুলোর কতক পাকা, কতকগুলোতে কেবল রঙ ধরেছে, কতকগুলো একেবারে কাঁচা। মাথার ওপর মেঘনিম্নুক্ত নীল আকাশ ; তার কোল ঘিরে বনাচ্ছন্ন নীলাভ শৈলমালা।

মহাদেব একটা সাল গাছের নীচে ঘাসের ওপর আধ-শোওয়া অবস্থায় রয়েছে। রোদটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে।

একটা গাছ থেকে পাকা কমলা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অমর বলল—“লোকটি হয়ত বেঁচে নেই”

—“পিশাচের প্রাণ অত সহজে বার হয় না”—

ফলগুলো পকেটে পূরে নিয়ে অমর মহাদেবের পাশে বসে

পড়ল। তারপর সেগুলো সব পকেট থেকে বার করে ঘাসের ওপর রেখে বলল, “নাও। বুনো কমলা মন্দ লাগে না। আজ কমলা আর পাকা কুল খেয়ে কাটাতে হবে। বর্শাখানা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি; কিন্তু এখনও কাজে লাগল না।”

একটা কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মহাদেব বলল—
“ও যদি মরেই থাকে ওর জাত ভাইরা মরেনি। এ ব্যাপারের প্রতিশোধ না নিয়ে কি তারা ছাড়বে!”

—“আমরা যে ওকে মেরেছি তা তো কেউ দেখেনি। দেখলে এটা ঠিক যে অক্ষত শরীরে কেউ এখনও থাকতাম না।” বলেই অমর হাতের কমলার খোসাগুলো সামনের জঙ্গলটার দিকে ছুড়ে দিল।

তারপর আবার বলল—“তুমি চমৎকার বুদ্ধি আঁটিয়েছিলে।” পাথরটি ওর পাশে গিয়ে পড়তেই সে দিকে যেই কিরে তাকালো—“আরে দেখ দেখ, ঐ পাহাড়টির ওপর থেকে একসার মানুষ নেমে আসছে—”

মহাদেব চট করে উঠে বসে চোখের ওপর হাত রেখে সামনের পাহাড়টার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

তাদের চারধারে পাহাড় ও ঘন জঙ্গল। তার মাঝে এই ছোট উপত্যকা ধানি। কিছু দূরে সাদা বালির মধ্যে দিয়ে খুব সরু একটি জলধারা বয়ে চলেছে। রৌদ্রের বালি ও জল রূপার মত চিকচিক করছে। ওটা যেন বনদেবীর গলার হার।